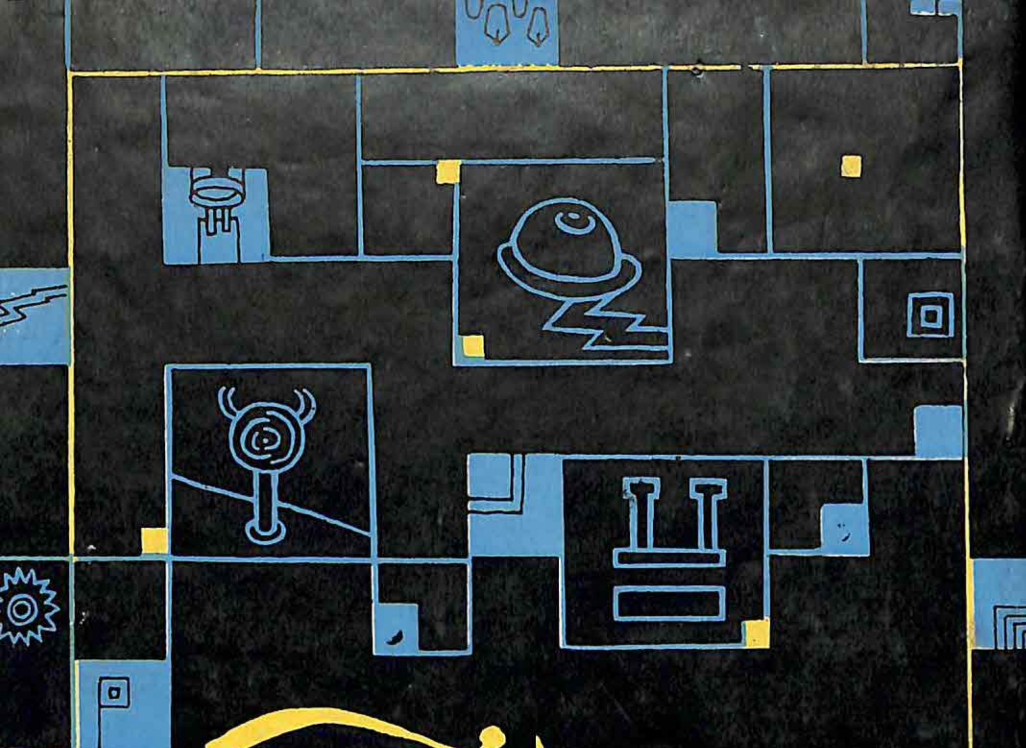


বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ—
রবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

তৃতীয় মুদ্রণ : ১৯৮৯

মূল্য ১০্ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
পি-২১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় অন্যতম পথিকৃৎ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন, সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বড় পরিচয় বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা। অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি একজন উৎসর্গীকৃত লেখক। প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। শুধু পশুপাখি-গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গের উপরেই নয় ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব নিউক্লীয় পদার্থ-বিদ্যা, প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও গবেষণার বিভিন্ন বিভাগে রচিত তাঁর বিস্ময়কর অনেক প্রবন্ধই আধুনিককালের বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। প্রবাসী, উদয়ন, আলোকা, পথ, নবারুণ, নতুনপত্র, আনন্দবাজার, যুগান্তর, শিশুসাথী, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ। যা আজও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।



'বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার' শুধুমাত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত রচনার একটি নির্বাচিত সঙ্কলন—যে সব রচনা আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের কাছেই শুধু নয়, বিজ্ঞান-পিপাসু সব বয়সের পাঠকের কাছেই পরম আগ্রহের বিষয়।

১ সূতা তৈরীর কল আবিষ্কারের কথা

অতি প্রাচীন কাল থেকেই চরকা এবং টাকুর সাহায্যে সূতা তৈরী হতো। আজকাল সূতা তৈরী হয় কলে। অবশ্য আজকালও চরকা এবং টাকুর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় নি। প্রায় শ'-দেড়েক বছর আগে সূতা তৈরীর কল উদ্ভাবিত হয়। সূতা তৈরীর কল প্রথমে কিভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল, সে কথাই বলছি।

আমাদের দেশের তাঁতীরা যেমন তাঁত বোনে ইংল্যাণ্ডের তাঁতীরাও সেরকম ভাবেই তাঁতে কাপড় বুনতো। কাটুনীরা চরকায় সূতা কেটে তাঁতীদের যোগান দিত। কিন্তু সারাদিন কাজ করেও হাতে-কাটা চরকার সূতায় তাঁতের যোগান দেওয়া সম্ভব হতো না। কাজেই সূতার অভাবে তাঁতীদের প্রায়ই তাঁত বন্ধ করে নিষ্কর্মা বসে থাকতে হতো। কিন্তু সাধারণ একজন লোকের বুদ্ধি-কৌশলে এই অবস্থার অবসান ঘটে।

খুব সাধারণ একটা আকস্মিক ঘটনা থেকে সূতা তৈরীর কল উদ্ভাবনের সূচনা হয়েছিল। জেমস্ হারগ্রিভ্‌স্ নামে একজন দুঃস্থ তাঁতীর স্ত্রী সূতা কাটবার সময় দৈবাৎ তার চরকার টাকুটা খুলে মাটিতে পড়ে যায়। হারগ্রিভ্‌স্‌ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন টাকুটা মাটিতে পড়েও ঠিক লাট্টুর মত ঘুরতে লাগলো। এই ব্যাপারটা দেখে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো যে, একটা টাকুর পরিবর্তে যদি কতকগুলি টাকু একই অবস্থায় রাখা যায় তবে তো সেগুলোকে একটা চাকার সাহয্যেই ঘোরানো যেতে পারে। তিনি তখনই কাজে লেগে গেলেন এবং অসীম ধৈর্য সহকারে কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এমন একটা কল তৈরী করতে সমর্থ হলেন যাতে একগাছা সূতার পরিবর্তে এক সঙ্গে দশগাছা সূতা তৈরী করা সম্ভব হলো। হারগ্রিভ্‌সের স্ত্রীর নাম ছিল জেনী। হারগ্রিভ্‌স্ তার স্ত্রীর নামানুসারে এই সূতা তৈরীর কলের নাম রাখলেন স্পিনিং জেনী।

হারগ্রিভ্‌স্ কিন্তু এই কল তৈরী করেও তেমন কিছু লাভবান হতে পারেন নি। এই নতুন কল উদ্ভাবনের ফলে সেই অঞ্চলের কাটনীরা সবাই হারগ্রিভ্‌সের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তাদের একটা ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, এই কল চালু হলে প্রতিযোগিতায় তারা মোটেই দাঁড়াতে পারবে না এবং তাদের রুজিরোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই তারা সবাই মিলে হারগ্রিভ্‌সের বাড়ি চড়াও হয়ে তার কলটাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। হারগ্রিভ্‌স্ নটিংহামে পালিয়ে গেলেন।

তাঁর উদ্ভাবিত এই অভিনব যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে যন্ত্রব্যবসায়ীরা যদিও প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন, হারগ্রিভ্‌স্ কিন্তু নিঃস্ব অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন।

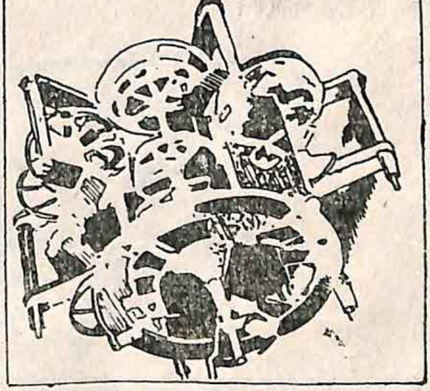
এর পরে যে সূতা তৈরীর কল তৈরী হয়, সেটির উদ্ভাবক হলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর তাঁত বোনা বা সূতা কাটার সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না ; চুলের প্রসাধন করাই ছিল তাঁর পেশা। তাঁর নাম হলো রিচার্ড অর্করাইট। কয়েক বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি সূতা তৈরীর এমন একটি কল উদ্ভাবন করেন যাতে একমাত্র তুলার পাঁজ যোগান দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজই হাতে করবার দরকার হতো না। সূতা তৈরী সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় কাজ স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই চলতো। তিনি এই কল বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং মৃত্যুকালে প্রচুর সম্পত্তি রেখে যান।

অর্করাইটের সূতা তৈরীর কল যতই উন্নত ধরনের হোক না কেন, তাতে কিছুটা ত্রুটিও ছিল। তাতে খুব মিহি সূতা তৈরী হতো না। আজকাল আমরা যেমন মিহি সূতার বস্ত্রাদি দেখতে পাই, সেই মিহি সূতা তৈরীর কল উদ্ভাবন করেছিল স্যামুয়েল কম্পটন নামে এক দুঃস্থ তাঁতীর ছেলে। এই ছেলেটির বেহালা তৈরী করবার উৎসাহ ছিল অদম্য। সে তাঁতের কাজ করতো এবং অবসর সময়ে বেহালা তৈরীতেই ব্যাপৃত থাকতো। কিন্তু তাকে এমনই নিকৃষ্ট সূতা নিয়ে তাঁতের কাজ চালাতে হতো যে, তার বেহালা তৈরীর জন্যে অতি সামান্য সময়ই থাকতো। এই জন্যে সে প্রায়ই চিন্তা করতো কলে কেমন করে মিহি সূতা কাটা যেতে পারে? এইরূপ চিন্তার ফলে কয়েক বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় সে এমন এক যন্ত্র উদ্ভাবন করলো যাতে আজকালকার মত মিহি সূতা তৈরী করা সম্ভব হলো। কম্পটন তাঁর এই নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্রের কৌশল কাউকে জানতে দেয় নি —সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বেশি দিন গোপন রইল না। আশেপাশের সব তাঁতীরাই অবাক হয়ে গেল—কম্পটন এমন মিহি সূতা কেমন করে তৈরী করে। কম্পটনের সূতা তৈরীর গোপন রহস্য জানবার জন্যে সবাই তারা উদগ্রীব হয়ে উঠলো। কিন্তু ব্যাপারটা জানা অত সহজ ছিল না। কম্পটন ছিল অতি সতর্ক এবং সঙ্গোপনে তার কাজ চালিয়ে যেতো। শুনা যায়, অনেক চেষ্টার পর একটা লোক কোন উঁচু জায়গায় লুকিয়ে থেকে একদিন তার সূতা তৈরীর যান্ত্রিক কৌশল দেখতে সক্ষম হয়। এ অবস্থায় তার উচিত ছিল, যন্ত্রের পেটেণ্ট নেওয়া। কিন্তু সে পেটেণ্ট না নিয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বস্ত্রব্যবসায়ীদের কাছে তার যন্ত্রের কৌশল বলে দেয়। কয়েক বছর পরে অবশ্য পার্লামেণ্ট তার আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাকে ৫০০০ পাউণ্ড পুরস্কার প্রদান করে। কিন্তু এই অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্যে যা ঋণ হয়েছিল পার্লামেণ্টের প্রদত্ত পুরস্কার থেকে তা-ও পরিশোধ করা সম্ভব হয় নি। কাজেই হারগ্রিভ্‌সের মতোই তাকে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হয়।

সূতা তৈরীর কলের আবিষ্কার কাহিনী শুনে তোমরা বিস্মিত হবে। তোমরা যদি কখনও কোন সূতা তৈরীর কারখানা দেখতে যাও তবে এই কথা মনে করে অবাক না হয়ে পারবে না যে, এই কল আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আজও এই কলগুলি সেই আবিষ্কারক নিঃস্ব তাঁতীর স্ত্রীর নামেই অভিহিত হচ্ছে।

২ অদ্ভুত ঘড়ি

তোমরা বিগ বেনের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। বিগ বেন হলো পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় ঘড়ি। বিলাতের পার্লামেন্টের উঁচু মঞ্চের উপর ঘড়িটি বসানো আছে। তাছাড়া জার্মেনীর স্ট্রাসবুর্গ জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল সময়-রক্ষক অপূর্ব ঘড়ির কথাও হয়ত শুনে থাকবে। কিন্তু সম্প্রতি ডেনমার্কে এদের চেয়েও এক বিস্ময়কর ঘড়ি তৈরী হয়েছে। এটিই হবে বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ঘড়িটি কোপেনহেগেনের টাউন হলে বসানো হচ্ছে। এতে কেবল ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ডই নয়—দিন, মাস, বছর, সূর্যের উদয়-অস্ত এবং উদয়াস্ত অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময়, চন্দ্র-সূর্যের ভবিষ্যৎ গ্রহণ এবং আরও অনেক কিছু দেখা যাবে। মোটের উপর, সৌরমণ্ডলের গতিবিধি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এতে দেখা যাবে। তাছাড়া আর একটি বিশেষত্ব এই যে, যে কোন লোক এই ঘড়ি দেখে তার জ্ঞাতব্য বিষয় চট্ করে বুঝে নিতে পারবে। ঘড়িটি নাকি তিন-চার হাজার বছর চলবে। এর কলকব্জা এরূপ নিখুঁত হিসেব মত তৈরী হয়েছে যে, ৩০০ বছরে বড় জোর ০·৪ সেকেণ্ড গরমিল হতে পারে।



অদ্ভুত ঘড়ি

এই অপূর্ব ঘড়িটির পরিকল্পনা করেন জেন্ অল্‌সেন নামে ডেনমার্কের একজন কারিগর। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘড়ি তৈরী করবার জন্যে তিনি কৃতসংকল্প হন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমে তিনি ইউরোপের প্রত্যেকটি শহরে ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘড়ি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। ১৯০২ সালে ডেনমার্কে ফিরে এসে তিনি এই অভিনব ঘড়ির পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে শুরু করেন। কলকব্জার প্রয়োজনীয় নক্সা ইত্যাদি তৈরী করতে ৩০ বছর কেটে যায়। ১৯৩৫ সালের মধ্যে জটিল যন্ত্রপাতির অনেকগুলো অংশ নির্মিত হয়। একখানি বৈজ্ঞানিক কাগজে তিনি এই ঘড়ির পরিকল্পনার যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ফলে এ বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা এই অপূর্ব কার্যকরী পরিকল্পনায় এতই বিস্মিত হয় যে, সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘড়ির নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ করবার জন্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। বিগত ১৬ বৎসরের চেষ্টায় এই ঘড়ির নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্‌সেন তাঁর চিরজীবনের সাধনার ফল এই অপূর্ব জিনিসটির পূর্ণ পরিণতি দেখতে পেলেন না; ইতিমধ্যেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

১৯৪৩ সালে অল্‌সেন অবশ্য এই ঘড়ির একটি নমুনা এবং নির্মাণ পদ্ধতির কতকগুলো নক্সা তৈরী শেষ করেছিলেন। ৪৬ শিট কাগজে ২১৪টি খুঁটিনাটি অঙ্কন সমেত ১৪টি নক্সার প্রত্যেকটির ৬টি করে কপি তৈরি করে নিরাপত্তার জন্য সেগুলোকে দেশের বিভিন্ন স্থানে রেখেছেন। ঘড়িটার ওজন হবে প্রায় ১১২ মণ এবং এতে একলক্ষ দশ হাজারের মত বিভিন্ন কলকব্জা আছে। তৈরীর খরচ লেগেছে প্রায় ১৫০,০০০ ড়লার। পরে তোমরা এই ঘড়ির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারবে।

রচনাকাল, ১৯৫১

৩ ধূলিকণার রহস্যময় ঘূর্ণন

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্প্রতি এক অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। রহস্যটা হচ্ছে—ধূলিকণার ঘূর্ণন। সূর্যালোকে ধরলেই ধূলিকণাগুলো নির্দিষ্ট পথ ধরে ঘুরে ঘুরে নৃত্য শুরু করে দেয়। কেন এমন হয়—সে কথা কেউ বলতে পারে না। এই রহস্যের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা বিশেষ ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

বায়ুশূন্য কাচের ফ্লাস্কে রক্ষিত ধূলিকণার উপর সূর্যালোক ফেলে ফেলিক্স আরেনহ্যাপ্ট নামে ভিয়েনার এক পদার্থ-বিজ্ঞানী এই অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কার করেছেন।

আলোক-রশ্মি পড়বামাত্রই কণিকাগুলো নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পথে ঘুরতে থাকে। ঘোরবার পথটা কিন্তু বৃত্তাকার নয়—ডিম্বাকৃতি। প্রত্যেকটি কণিকা নিজ নিজ মেরুদণ্ডের উপর পাক খেতে খেতে ডিম্বাকৃতি পথে ছুটতে থাকে। সেটাও নির্ভর করে আলোক-রশ্মির উপর ; অর্থাৎ এই পথটা খাড়াভাবে হবে, কি শয়ানভাবে হবে, না অন্য কোন দিকে হবে—সেটা আলোক-রশ্মির আপতন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। আলো যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ নিয়মিতভাবেই ঘূর্ণন চলে ; কিন্তু হঠাৎ যদি একখণ্ড মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গেই ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যায়। ধূলিকণার এই অদ্ভুত ঘূর্ণন, সূর্যের চারদিকে আমাদের পৃথিবীর ঘূর্ণনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।



সূর্যালোক সম্পাতে এক দৃশ্য

কণাগুলো ঘোরে কেন? সূর্য-রশ্মির প্রভাবে উত্তপ্ত বায়ুস্রোতের জন্য নিশ্চয়ই নয়! কারণ, ধূলিকণাগুলো থাকে বায়ুশূন্য ফ্লাস্কের মধ্যে। তবে এই

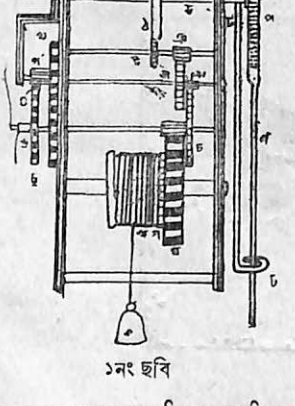
আবর্তনের কারণ কি? আজ পর্যন্ত যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম জানা গেছে তার কোনটাতেই এই ঘূর্ণন-রহস্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। তবে কি কোন নতুন শক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে?

আরেনহ্যাপ্টের ধারণা—বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সম্পূর্ণ আলাদা একরকমের চৌম্বক শক্তির অস্তিত্ব আছে। এই চৌম্বক শক্তির প্রভাবেই ধূলিকণার গতিবেগের উদ্ভব ঘটে। এই অভিনব আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হলেও যথোপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আরেনহ্যাপ্টের এই মতবাদ বিজ্ঞানীমহল কর্তৃক এখনও সমর্থিত হয় নি।

রচনাকাল, ১৯৫১

৪ ঘড়ির কথা

সময়ের হিসেব রাখবার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পদে পদে অনুভব করে আস্‌ছে। তার ফলে, প্রাচীন যুগেই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে সময় নির্ধারণের বিবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল। জল-ঘড়ি, বালি-ঘড়ি, সূর্য-ঘড়ি, দাগকাটা বাতি এবং আরও কত রকমের সময়-নির্দেশক ব্যবস্থা যে প্রচলিত হয়েছিল সে সব কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাসের কথা তোমরা আর একদিন শুনবে। আমাদের নিত্যপরিচিত ঘড়ির যান্ত্রিক-কৌশলের বিষয়ে তোমাদিগকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি কথা বলছি।

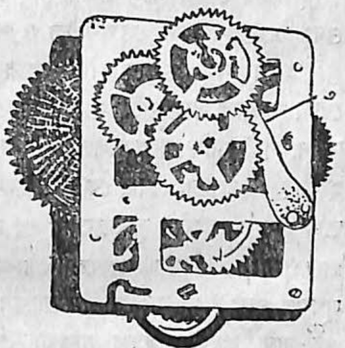


১নং ছবি

আজকাল রকমারি দেয়াল ঘড়ি, পকেট ঘড়ি, হাত ঘড়ির ব্যবহার দেখা যায়। খুঁটিনাটি কল-কৌশলের বৈচিত্র্য ছাড়া প্রায় সব রকমের ঘড়ির যান্ত্রিক-কৌশলই মূলতঃ পেণ্ডুলামের দোলন-রীতি অনুসারে গঠিত। আজ থেকে প্রায় ৩৬৯ বছর পূর্বে পিসা নগরীর এক গীর্জায় বাতির ঝাড়ের দোলন দেখে গ্যালিলিও পেণ্ডুলামের দোলন-নিয়ম আবিষ্কার করেন। সেই পেণ্ডুলাম থেকেই দোলক ঘড়ির উদ্ভাবন সম্ভব হয়। এই পেণ্ডুলাম ঘড়িও কার্যতঃ ব্যবহারোপযোগী হয়েছিল তার

প্রায় ৯৩ বছর পরে—হয়ঘেনস্‌-এর চেষ্টায়। কিন্তু আরও প্রায় একশত বছর পরে জর্জ গ্র্যাহাম ঘড়ির এস্‌কেপমেণ্টের অধুনা প্রচলিত উন্নততর ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। পেণ্ডুলাম ঘড়ি এক জায়গায় বসিয়ে রাখলে ঠিক মত চলতে পারে, অন্যথায় অচল। কিন্তু ব্যালান্স হুইল, এস্‌কেপমেণ্টের কৌশলে নির্মিত ঘড়ির কোন অবস্থাতেই চলার ব্যাঘাত ঘটে না।

ঘড়ি কেমন করে চলে এখন সে কথাই বলছি। যদিও কেবল বর্ণনার সাহায্যে যান্ত্রিক কৌশলের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝানো সহজ নয় তবুও ছবির সাহায্যে হয়তো মোটামুটি ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে। ১ নম্বরের ছবিটা দেখ। এতে পেণ্ডুলাম ঘড়ির কৌশলটা দেখানো হয়েছে। ছবির নিচের দিকে ঘ চিহ্নিত একটি বড় চাকা। তার গায়ে গ চিহ্নিত একটি ছোট চাকা। গ চিহ্নিত চাকার পরেই খ চিহ্নিত একটা খাঁজ কাটা ড্রাম। খ চিহ্নিত ড্রাম সমেত বড় চাকাটা নিচের দিকে ঘোরে। যদি ড্রামটার গায়ে একটা সরু তার জড়িয়ে প্রান্তভাগে ক চিহ্নিত ভারের মত কোন একটা ভার ঝুলানো যায় তবে কি হবে? ভারের টানে ড্রামটা ঘুরতে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে ঘ চাকাটাও ঘুরবে। ঘ চাকাটার সঙ্গে চ, জ, ট চিহ্নিত চাকাগুলো পরস্পরের সঙ্গে দাঁতে দাঁতে সংলগ্ন। কাজেই ঘ চাকাটা ঘুরলে অন্য চাকাগুলোও ঘুরবে। তবে ঘ চাকা ঘুরবে খুব ধীরে, চ একটু বেশি,



২নং ছবি

জ আরও বেশি এবং ঞ বা ট সবচেয়ে বেশি দ্রুতগতিতে ঘুরবে। কিন্তু কথা হচ্ছে ড্রামে জড়ানো তারের সবগুলো পাক খুলে গেলে আবার কেমন করে তাকে সহজে জড়ানো সম্ভব হবে? ঘড়িতে চাবি দেওয়ার ব্যাপারটাই হলো এইখানে। ঘ চাকার রডের অর্থাৎ অক্ষদণ্ডের বাইরের দিকটা চৌকো। ওতে চাবি পড়িয়ে ঘোরালেই ড্রামসহ রড্‌টা উল্টোদিকে ঘুরতে পারে। কিন্তু ঘ চাকাটা যেমন আছে তেমনই থাকবে, উল্টোমুখে ঘুরবে না। কেমন করে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে ২ নম্বরের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। ২ নম্বরের ছবিতে খ চিহ্নিত জিনিসটা একটা ক্লিপ—ক চিহ্নিত স্প্রিং দিয়ে চাকার বাঁকানো দাঁতের মধ্যে চেপে ধরা আছে।

পরিবর্তে ড্রাম বা ব্যারেলের মধ্যে স্প্রিং জড়ানো থাকে। স্প্রিংটাকে চাবি দিয়ে জড়িয়ে দিলে ঠিক ঝুলানো ভারের মতই কাজ করবে; অর্থাৎ জড়ানো স্প্রিংটা খোলবার ফলে সমস্ত চাকাগুলোই ঘুরতে থাকবে।

পূর্বেই বলেছি—ট চিহ্নিত চাকাটা খুব দ্রুতগতিতে ঘোরে ; কিন্তু ঠ চিহ্নিত জিনিসটা তাকে ঠেকিয়ে রাখে। ঠ চিহ্নিত জিনিসটাকে বলা হয় প্যালেট্‌স্। প্যালেট্‌স্-এর দুটা বাহু ঢেঁকিকলের মত এদিক ওদিক ওঠা-নামা করতে পারে। ১ নম্বর চিত্রের ট চিহ্নিত চাকার দাঁতগুলো দেখ্‌ছো তো—একদিকে হেলানো। এই চাকাটাকে বলা হয় স্কেপ-হুইল। স্কেপ-হুইল দ্রুতবেগে ঘুরে যেতে চায়। কিন্তু আটকা পড়ে ওই প্যালেট্‌স্-এর সূক্ষ্মাগ্র কাঁটায়। প্যালেট্‌স্ আটকানো থাকে ১নং চিত্রের ড চিহ্নিত রডের গায়ে। এই রডের ডানপ্রান্তে সরু একটা লম্বা তার এঁটে দেওয়া হয়েছে। এই তারটার সামনেই ফ্রেমে আটকানো প চিহ্নিত একটা পাতলা স্প্রিং-এর সঙ্গে ণ চিহ্নিত লম্বা তার জুড়ে তার নিচের প্রান্তে পেণ্ডুলামটি ঝুলিয়ে দেওয়া থাকে। চাকাগুলো যাতে তাড়াতাড়ি ঘুরে যেতে না পারে তার জন্যেই পেণ্ডুলামের প্রয়োজন। পেণ্ডুলাম হচ্ছে গতি নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র। পেণ্ডুলামের তারটা গলে যাওয়া চাই ঢ চিহ্নিত তারের প্রান্তের গেরোর মধ্য দিয়ে। ৪নং চিত্রে পেণ্ডুলাম, স্কেপ-হুইল ও প্যালেটের ব্যবস্থা বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।

এখন পেণ্ডুলামটাকে যদি দুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কি হবে? পেণ্ডুলামটা দোল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২ নম্বরের তারটাও দোল খাবে। ১ নম্বর চিত্রের ঞ, ট, ঠ, ড, ণ, প ইত্যাদি অংশগুলোকেই ২নং চিত্রে ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে। আচ্ছা, এবার কৌশলটাকে বোঝবার চেষ্টা কর। ১নং রডের সঙ্গে ২নং তার এবং প্যালেটটা দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। কাজেই পেণ্ডুলামের দোলনের সঙ্গে সঙ্গে প্যালেটটাও এদিকে ওদিকে ওঠা-নামা করতে থাকে। পূর্বেই বলেছি প্যালেটের সূক্ষ্মাগ্র ৪নং চাকাটাকে আটকে রাখে। নচেৎ চাকাটা দ্রুতবেগে ঘুরে যেত। প্যালেটটা ওঠা-নামা করবার মুখে চাকাটা এক এক দাঁত করে থেমে থেমে ঘুরতে থাকে। স্কেপ হুইলের দাঁতগুলোর গঠন দেখছো তো? —টেরছা করে কাটা—সাধারণ চাকার দাঁতের মত সোজা নয়। এই জন্যে প্যালেটের সূক্ষ্মাগ্র, চাকার দাঁতের ফাঁক থেকে পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করবার সময় পেণ্ডুলামের দোলনের তালে তালে তাতে এক একটা করে ঝাঁকুনি লাগে। এর ফলে পেণ্ডুলামের দোলনও অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। পেণ্ডুলাম, প্যালেট ও স্কেপ-হুইলের কৌশলে চাকাগুলোকে অতি মন্থরগতিতে একটু একটু করে ঘুরতে হয় বলে একবার দম দিলে ঘড়ি ৭।৮ দিন কি তারও বেশি সময় ধরে চলতে পারে।

ঘড়ির কাঁটা কিভাবে ঘোরে—এবার সেটা দেখা যাক। এবার ১ নম্বর চিত্রের বাঁ-দিকের অংশটা লক্ষ্য কর। চ-চাকার ঙ চিহ্নিত রড্‌টা বাঁ-দিকে অনেকটা বেরিয়ে আছে। রডের এই বাইরের অংশটুকুর গোড়ার দিকে আটকানো আছে ছোট্ট একটা চাকা। এই চাকাটা আবার খ চিহ্নিত বড় চাকাটার সঙ্গে দাঁতে সংলগ্ন। ছ চিহ্নিত চাকাটা রডের গায়ে আলতোভাবে বসানো আছে। গ দাঁতের সঙ্গে সংলগ্ন থাকার ফলে ছ চাকাটা অতি ধীরে ধীরে ঘোরে। এই চাকাটার সঙ্গেই

ঘড়ির ডায়েলের উপরে ঘণ্টার কাঁটা বসানো থাকে। মিনিটের কাঁটা বসানো থাকে ড চিহ্নিত রডের প্রান্তভাগে।

পেণ্ডুলাম ঘড়ির প্রধান অসুবিধা হলো—একে নির্দিষ্টভাবে কোন স্থানে বসিয়ে রাখলে ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারে ; কিন্তু কোন রকমে স্থানচ্যুতি ঘটলে—হয় সময়ের ব্যতিক্রম ঘটবে, নয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে পেণ্ডুলামের স্থলে ব্যালান্স হুইলের প্রবর্তন হয়। সূক্ষ্ম আলের উপর একটা ভারী চাকা বসানো। কুণ্ডলী করা খুব পাতলা একটা সরু স্প্রিং-এর ভিতরের প্রান্তভাগ আটকানো থাকে চাকার রডের সঙ্গে। স্প্রিং-কুণ্ডলীর বাইরের প্রান্তভাগ আবদ্ধ থাকে ঘড়ির ফ্রেমের সঙ্গে। এ-অবস্থায় চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিলে পেণ্ডুলামের এদিক-ওদিক দোলনের মত পর্যায়ক্রমে একবার এদিকে, আবার ওদিকে পাক খেতে থাকবে। চাকাটার এই এদিক-ওদিক পাক খাওয়া যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে—ঢেঁকিকলের মত শয়ানভাবে স্থাপিত একটা লম্বা রড্ বা লিভারের। ব্যালান্স হুইলের একপাশ থেকে ছোট্ট একটা কাঁটা বেরিয়ে থাকে। এই কাঁটাটা, চাকার পাক-খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক করবার সময় ঢেঁকিকলের মত লিভারটাকেও পর্যায়ক্রমে একবার এদিকে আবার ওদিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এর ফলে স্কেপ-হুইল একটু একটু করে ঘুরতে থাকে। মোটের উপর পেণ্ডুলাম ঘড়ির যে যান্ত্রিক-কৌশলের কথা বলেছি এতেও সেই একই ব্যবস্থা। ব্যতিক্রমের মধ্যে কেবল হেয়ার-স্প্রিং ও ব্যালান্স হুইল। বড় চাকার উপর মেইন স্প্রিং বাঁধা আছে।

পকেট ঘড়ি এবং হাত ঘড়ির যান্ত্রিক-ব্যবস্থাও ঠিক এই রকমের। তবে খুঁটিনাটি কতকগুলো যান্ত্রিক-কৌশলের পার্থক্য আছে। ঘড়ি চলার কৌশলটা যদি বুঝে থাক তবে পকেট ঘড়ি বা হাতঘড়ির কৌশলটাও অনুমান করতে পারবে।

রচনাকাল, ১৯৪৯

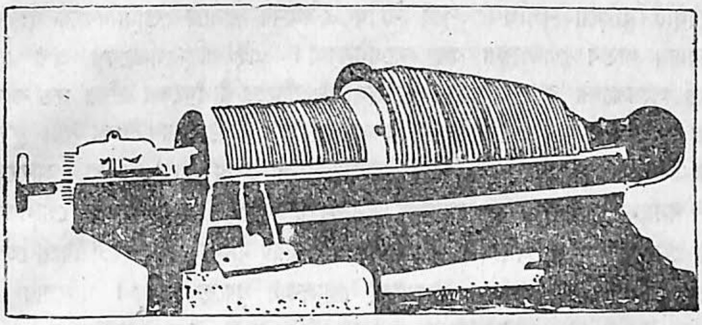
৫ স্টীম টারবাইন

'টারবাইন' কথাটার অর্থ হলো ঘূর্ণি বায়ু। স্টীম বা বাষ্পের ধাক্কায় যে যন্ত্র ঘূর্ণিবায়ুর মত জোরে ঘুরতে থাকে তাকে বলা হয় স্টীম টারবাইন। স্টীম এঞ্জিন ও স্টীম টারবাইন একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু উভয়ের চলবার কৌশল বিভিন্ন। স্টীম এঞ্জিনের মোটামুটি বিবরণ থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ অনেক রকম যান্ত্রিক-কৌশলের ব্যবস্থা করে বাষ্পের সাহায্যে কাজ আদায় করে নেওয়া হয়। কিন্তু স্টীম টারবাইনে স্টীম এঞ্জিনের মত অত জটিল কলকৌশলের বালাই নেই। খুব সহজ উপায়ে ঘুড়ির লাটাইয়ের মত লৌহ-নির্মিত বিরাট এক একটা পদার্থ বাষ্পের ধাক্কায় ঝড়ের মত ঘুরে যাচ্ছে। শহরের মত বিরাট এক একটা জাহাজকে টারবাইন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অথচ তার কল-ঘরে ঢুকে দেখ একটানা একটা মিহি-সুরের মত শব্দ ছাড়া আর কিছুই তোমার কানে যাবে না। তা ছাড়া কোন যন্ত্রপাতিরও ঝামেলা নেই। আর যেসব যান-বাহন, কল-কারখানা স্টীম এঞ্জিনের সাহায্যে চলে, তাদের কল-ঘরে ঢুকে দেখ, মনে হবে, যেন শত সহস্র দৈত্য-দানব ঝাঁঝর জিঞ্জিরের ঝনঝনা তুলে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। তাদের আস্ফালনে পায়ের নিচে মাটি থরথর করে কাঁপছে, শব্দে কানে তালা লেগে যাবে। মোটের উপর স্টীম টারবাইনের তুলনায় স্টীম এঞ্জিনের কতকগুলো কার্যকরী অসুবিধা আছে। তবে ছোটখাট কলকারখানা বা যন্ত্রপাতি চালাতে স্টীম এঞ্জিনই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। কিন্তু সুবিশাল রণপোত, লাইনার, বিরাট ডায়নামো বা বৃহৎ কলকারখানা চালাতে টারবাইনের কার্যক্ষমতা অতুলনীয়। টারবাইনের ঘূর্ণনবেগ অসম্ভব বেশি। এই ঘূর্ণনবেগ কমিয়ে আনতে না পারলে টারবাইন থেকে কাজ পাওয়া শক্ত। ঘূর্ণনবেগ বেশি হলে কেন কাজ পাওয়া যায় না, একটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা' পরিষ্কার বুঝতে পারবে। ১৮৯৪ সালে টার্বিনিয়া নামক ছোট্ট একখানা বিলিতি জাহাজে সর্বপ্রথম স্টীম টারবাইন বসিয়ে পরীক্ষা করা হয়। টারবাইন চালানো হলো। অসম্ভব বেগে ঘুরতে লাগলো, জাহাজের প্রোপেলার। (প্রোপেলার, ইলেকট্রিক



১নং ছবি: স্টীম টারবাইন

পাখার মত একটা যন্ত্র। জাহাজের পিছনে জলের নিচে থাকে। ঘূর্ণায়মান প্রোপেলার, স্ক্রুর প্যাঁচের মত জল কেটে জাহাজখানাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে



২নং ছবি : স্টীম টারবাইন

যায়।) প্রোপেলার ঘুরছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জাহাজ তো এগুতে চায় না। অনেক চেষ্টায় বোঝাই গরুর গাড়ির মত খানিকটা এগুলো বটে, কিন্তু গতিবেগ ঘণ্টায় মাইলখানেকও নয়। এঞ্জিনিয়ার মহলে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল—ঝড়ের বেগে প্রোপেলার ঘুরছে অথচ জাহাজ চলছে না—এতো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার! পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। কাচের জানালা দেওয়া বৃহৎ জলের ট্যাঙ্কে বিভিন্ন গতি-বেগে প্রোপেলার ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং ফটো নেওয়া হতে লাগল। অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে দেখা গেল, প্রোপেলার যখন মিনিটে ১৫০০ বার করে পাক খেতে থাকে তখন তার চারদিকে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়। জলের নিচে এই ফাঁকা জায়গাটা অনবরতই একটা কুঠুরীর মত ঘূর্ণায়মান প্রোপেলারটাকে ঘিরে থাকে। কাজেই প্রোপেলারটা জলে ধাক্কা দিয়ে জাহাজখানাকে আর সামনে ঠেলে নিতে পারে না। ছোট বড় চাকা সংযোগে প্রোপেলারের ঘূর্ণন-বেগ কমিয়ে সমস্যা সমাধানের মতলব হলো ; কিন্তু দেখা গেল, তাতে অযথা বাষ্প খরচ হয়ে যায়। অথচ স্বাভাবিক ভাবে চালালেও প্রোপেলারের ঘূর্ণন-বেগ হয়ে যায়—অসম্ভব বেশি। অবশেষে সার চার্লস্ পারসন্স্ অভিনব উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করেন।

টার্বিনিয়া জাহাজে ছিল একটা মাত্র টারবাইন ও বড় রকমের একটা প্রোপেলার। সেখানে তিনি পরস্পর সংলগ্ন তিনটা ছোট ছোট প্রোপেলার বসিয়ে দিলেন। একই বাষ্প পর পর তিনটা টারবাইনের ভিতর প্রবেশ করে তিনটা প্রোপেলার ঘুরিয়ে দিত। তিনটা টারবাইনের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে প্রোপেলারের ঘূর্ণন-বেগ কমে গিয়ে মিনিটে পাঁচশ'বার করে পাক খেতে লাগলো। পারসন্স্ উদ্ভাবিত এই নতুন ধরনের টারবাইন বসিয়ে ১৮৯৭

২

সালে টার্বিনিয়াকে আবার জলে ভাসানো হলো। এবার টার্বিনিয়া সবাইকে বিস্মিত করে অসম্ভব দ্রুতগতিতে জল কেটে চলতে লাগলো।

স্টীম টারবাইনের উৎপত্তি এবং তার চলবার কৌশল সম্বন্ধে এখন তোমাদিগকে মোটামুটি বুঝিয়ে বলছি। পূর্বে স্টীম এঞ্জিনের প্রসঙ্গে তোমাদিগকে হিরোর ঘূর্ণায়মান ধাতব গোলকের কথা বলেছিলাম। এই ধাতু-গোলকের আর একটু উন্নত সংস্করণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ১নং চিত্রের বাঁ-দিকের ছবির মত করে। নিচে বড় একটা আবদ্ধ-মুখ কড়াইয়ের মত বয়লার। বয়লারের উপর দুটো খুঁটির মধ্যে একটা ফাঁপা। খুঁটি দুটোর বাঁকানো মুখের উপর ফাঁপা গোলকটা আল্‌তো-ভাবে বসানো। বয়লার থেকে বাষ্প উঠে ফাঁপা নলের ভিতর দিয়ে গোলকটার মধ্যে প্রবেশ করে। সেখান থেকে গোলকের গায়ের বাঁকানো মুখ দুটো দিয়ে জোরে বেরিয়ে যায়। এই বাষ্পের ধাক্কাতেই গোলকটা ঘুরতে থাকে। হিরোর এই ঘূর্ণায়মান ধাতব গোলকই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বপ্রথমে উদ্ভাবিত অতি সরল গঠনের স্টীম টারবাইন ও স্টীম এঞ্জিন। উভয়েই চলে বাষ্পের সাহায্যে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য হচ্ছে এই যে, টারবাইন চলে—বাষ্পের ধাক্কায়, আর এঞ্জিন চলে—বাষ্পের চাপে। যাহোক, হিরোর এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল খৃস্টের জন্মের প্রায় দুশো বছর আগে। তারপর অনেককাল পর্যন্ত এ যন্ত্রের উন্নতি করবার জন্যে কেউ কিছু চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়নি। এরপরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবার টারবাইনের মত এক রকম যন্ত্র উদ্ভাবনের কথা জানা যায়। ১৬২৯ সালে ব্র্যাংকা নামে একজন ইটালিয়ান এক অদ্ভুত যন্ত্র তৈরি করেন। ১নং চিত্রের ডানদিকের ছবিটা দেখলেই ব্র্যাংকা-উদ্ভাবিত টারবাইনের কৌশলটা বুঝতে পারবে। একটা ভারী চাকার গায়ে পর পর কতকগুলো ছোট ছোট খাঁজ কাটা। বেড়টার খুব কাছেই টেরছাভাবে একটা নল বসানো আছে। এই নলের মধ্য দিয়ে বয়লার থেকে খুব জোরে বাষ্প বেরিয়ে আসে। এই বাষ্পের ধাক্কাতেই চাকাটা ঝড়ের বেগে ঘুরতে থাকে।

এর পরে ১৬৮০ সালে সার আইজাক নিউটন বাষ্পের ধাক্কায় গাড়ি চালানোর এক অপূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। গাড়ির মধ্যে স্থাপিত হয় বয়লার। বয়লারের নিচে আগুনের চুল্লী। বয়লার থেকে পিছন দিকে বর্ধিত নল। এই নলের মুখ দিয়ে প্রচণ্ডবেগে বাষ্প নির্গত হয়। এই বাষ্পের ধাক্কাতেই গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যায়। নলের গোড়ার দিকে একটা চাবি বসানো আছে। এই চাবিটার সংগে একটা লম্বা 'রড' বা ডাঁট যোগ করা। এই ডাঁটটার সাহায্যে চালক ইচ্ছামত বাষ্প বেরুবার পথ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে।

যাহোক, ব্র্যাংকার যন্ত্র উদ্ভাবনের পর আড়াইশ' বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে উন্নত ধরনের টারবাইন নির্মাণের চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু কোনটাই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৮৪৮ সালে আভেরি নামে যুক্তরাষ্ট্রের এক ভদ্রলোক নতুন

একরকম স্টীম টারবাইনের পেটেন্ট নেন। কয়েক বছর পর্যন্ত এই যন্ত্র বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু উন্নত ধরনের স্টীম এঞ্জিন আবির্ভাবের ফলে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ১৮৮২ সালে সুইডেনের অধিবাসী ডাঃ ডি লাভালই প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যকরী স্টীম টারবাইন নির্মাণ করেন। তাঁর তৈরি টারবাইনে খাঁজ-কাটা চাকাটার উপর টেরছা-কাটা নলের মুখগুলো খুব কাছাকাছি বসানো আছে। একই সময় চারটা নলের মুখ থেকে নির্গত বাষ্পের ধাক্কায় চাকাটা প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে।

বর্তমান যুগে যে সব প্রচণ্ড শক্তিশালী টারবাইন ব্যবহৃত হয় তার উদ্ভাবক হচ্ছেন সার চার্লস পারসন্স্। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি লাভাল-টারবাইনের অদ্ভুত উন্নতি বিধান করেন। লাভাল-টারবাইনে ছিল একটা চাকা। চাকাটার বেড়ের পাশে ছোট ছোট খাঁজ কাটা। পারসন্স্ একটা চাকার পরিবর্তে একটা লম্বা স্যাফট্ বা 'রডের' উপর গায়ে গায়ে লাগিয়ে অনেকগুলো চাকা বসিয়ে দিলেন। চাকাগুলোর বেড় ছোট থেকে একদিকে ক্রমশঃ বড় হতে হতে আবার একটু ছোট হয়ে গেছে। জিনিসটা দেখতে মস্ত বড় একটা পিঁপের মত। পিঁপেটার ঠিক মধ্যদিয়ে লম্বালম্বি ভাবে একটা প্রকাণ্ড রড চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটের উপর, সব নিয়ে জিনিসটা হয়েছে যেন প্রকাণ্ড একটা ঘুড়ির লাটাইয়ের মত। ২নং ছবি দেখে জিনিসটা সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবে। এই লাটাইটা বসানো থাকে উভয় দিক বন্ধ বিরাট একটা চোঙের মধ্যে। লাটাইয়ের চাকাগুলোর বেড়ের উপর একদিকে বাঁধানো সরু সরু অসংখ্য খাঁজ আছে। প্রত্যেকটা চাকার গায়ে সরু অথচ পাতলা অসংখ্য পাত বসিয়ে এই খাঁজের সৃষ্টি করা হয়েছে। একটা থেকে আর একটা চাকার মধ্যে যে ফাঁক আছে, সেই ফাঁকের মধ্যে খাপ খেয়ে বসতে পারে এরকমের মিল রেখে বিরাট চোঙটার ভিতরের দিকের গায়ে, চাকা-গুলোর মতই অসংখ্য সূক্ষ্ম পাতের বেড় আছে। বয়লার থেকে প্রচণ্ড-চাপের বাষ্প এসে একদিক দিয়ে চোঙটার ভিতরে ঢোকে, আবার অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। লাটাইয়ের চাকা ও চোঙের গায়ের পাতগুলোর মধ্যের ঈষৎ বাঁকানো ফাঁকই হচ্ছে বেরিয়ে যাবার রাস্তা। বিশাল এক একটা বয়লার থেকে এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাঁকের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বাষ্প বেরিয়ে যাবার সময় ওই লক্ষ লক্ষ পাতলা পাতগুলোর উপর সমবেত ধাক্কার ফলে লাটাইয়ের মত বিরাট বস্তুটা ঝড়ের বেগে ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণায়মান বস্তুটার স্যাফ্‌টের সংগে সংযুক্ত হয়েই জাহাজের প্রোপেলার চলে, ডায়নামো ঘোরে এবং আরো কত বিরাট কলকব্জা তাদের নিয়মিত কাজ চালিয়ে যায়।

বোধহয় টারবাইন চলবার মোটামুটি কৌশলটা তোমরা বুঝতে পেরেছ। বহুকাল থেকেই মানুষ জল-ভূত, বায়ু-ভূতকে দিয়ে জলচক্র প্রভৃতি যন্ত্র চালিয়ে কাজ আদায় করে নিচ্ছিল। কিন্তু জল-ভূতকে বাষ্পে রূপান্তরিত করলে তাকে দিয়ে আরও

বেশি কাজ করানো যায়, এ রহস্যটা জানবার পর থেকেই মানুষ—বাষ্পরূপী জল-ভূতকে দিয়ে তার বেশির ভাগ কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

এখানেও সেই জল-ভূতকে দিয়ে কাজ করানোর ব্যাপার। তোমরা আলিপুর পশুশালায় বা কোন কোন পার্কের প্রবেশ-পথে ঘূর্ণনক্ষম দরজা দেখেছ নিশ্চয়ই। ধর, একটা বড় হলঘরে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। হলঘর থেকে বেরিয়ে যাবার একটা মাত্র দরজা। একবারে একজনের বেশি লোক বেরুতে পারে না। প্রত্যেকটি লোক বেরুবার সময় দরজাটা খানিকটা করে ঘুরে যায়। হঠাৎ যদি হলঘরে আগুন লেগে যায় তবে সব লোকই একসংগে বেরিয়ে আসতে চাইবে কিন্তু একবারে একজনের বেশি বেরুবার উপায় নেই বলে স্রোতের মত পর পর লোক বেরুতে থাকবে আর সংগে সংগে দরজাটাও চর্কির মত ঘুরতে থাকবে। এখানেও জল-ভূতকে বয়লারে আটকে রেখে প্রচণ্ড উত্তাপে তাকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। সেখান থেকে বাষ্প বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘূর্ণনক্ষম বিরাট একটা লাটাইয়ের গায়ের উপর দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আকাবাঁকা পথ করে দেওয়া হয়েছে। বাষ্প এই সব পথ দিয়ে যায়। এই সমবেত ধাক্কাতেই টারবাইনের ঘূর্ণায়মান গতি উৎপন্ন হয়।

রচনাকাল, ১৯৪৮

৬ নিব তৈরির কথা

প্রাচীন কালে কি দিয়ে লিখতো ?

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে খাগ বা শরের কলম দিয়ে ভোজপাতার উপর লেখার রীতি ছিল। ভোজপাতা এক রকম গাছের পাতলা ছাল। তারপর তালপাতার উপর লেখার রেওয়াজ হয়। তারপরে প্রচলন হয় তুলট কাগজের। তুলট কাগজে লেখবার জন্যে পাখির পালকের কলমই বেশি ব্যবহৃত হতো। রোমানদের সময় কাগজের প্রচলন ছিল না। তখনকার লোকেরা ছোট ছোট মোমের পাতের উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এক রকম শলাকা দিয়ে লিখত। তার নাম ছিল 'স্টাইলাস'। তারপরে তারা শরের কলম ব্যবহার আরম্ভ করে। কাগজ আবিষ্কারের পর থেকে পালকের কলম বা কুইল পেনের ব্যবহার প্রচলিত হয়। আজকালও অনেকে 'কুইল পেন' ব্যবহার করে থাকেন। রাজহাঁস বা ময়ূরের বড় বড় পালক থেকেই 'কুইল পেন' তৈরি হয়। ছোট ছুরি দিয়ে পালকের কলম কাটা হতো বলে এই ছুরির নামই হয়েছে— 'পেন নাইফ'।

সর্বপ্রথম ধাতুনির্মিত কলম বা নিবের ব্যবহার শুরু কখন ?

১৭৮০ সালে বার্মিংহামের মিঃ হ্যারিসন নামে এক ভদ্রলোক সর্বপ্রথম ধাতু নির্মিত নিব তৈরি করেন। কিন্তু তারপর বহুকাল পর্যন্ত জনসাধারণ সে জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়নি। ১৮৮৫ সালেও বিলেতে এক ডজন নিবের দাম ছিল ১৮ শিলিং। বারোটা নিবের এত চড়া দামের কথা শুনে তো আজকাল তোমরা শিউরে উঠবে! কিন্তু তখন নিব তৈরি হতো হাতে আর এখন তৈরি হয় কলে।

কি দিয়ে নিব তৈরি হয় ?

আজকাল নানারকম ধাতু থেকে নিব তৈরি হয়। তবে একাজে ইস্পাতই বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বার্মিংহামকেই নিব তৈরির কেন্দ্রস্থল বলা যেতে পারে। নিব তৈরির জন্যে শেফিল্ড থেকে ছ'ফুট লম্বা এবং প্রায় দেড় ফুট চওড়া ইস্পাতের চাদর বার্মিংহামের কারখানায় আসে। দৈনিক প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ নিব তৈরি হয় এবং এতে দৈনিক তিন টনেরও বেশি ইস্পাত লাগে।

কেমন করে নিব তৈরি হয় ?

প্রায় ষোলটা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিব তৈরি হয়ে আসে। প্রথমে নিবের চওড়া দিকের ঠিক মাপ মত ইস্পাতের চাদরটাকে লম্বা ফালি করে কাটা হয়—এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়—কাটিং। তারপর ফালিগুলোকে পুড়িয়ে এবং ঠাণ্ডা করে এমনভাবে পান দেওয়া হয় যাতে সেগুলো স্প্রিঙের মত প্রয়োজনানুরূপ স্থিতিস্থাপক হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়—'অ্যানিল করা'। এরপরে সেগুলোকে ডলাই-কলে ফেলে যথোপযুক্ত পাতলা করা হয়। ডলাই-কল থেকে পাতগুলো মসৃণ ও চকচকে হয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর প্রেস মেশিনের সাহায্যে পাতের দুধারে সারিবদ্ধভাবে মোটামুটি আকারে নিবগুলো কাটা হয়ে যায়। এগুলোকে বলা হয়—ব্ল্যাংকস্।



নিব তৈরি

এরপরে স্ট্যাম্পিং মেশিনে মাথার দিকে চোখ কেটে নামের ছাপ ও মার্কা দেওয়া হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট আকৃতিতে পরিণত করবার আগে পুনরায় এগুলোকে 'অ্যানিল' করা দরকার। পুনরায় 'অ্যানিল' করে সেগুলোকে অনেকটা নরম করা হয়। নরম হবার পর সেগুলোকে এমনভাবে পরিষ্কার করা দরকার যেন তাতে একটুও ময়লা বা তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে ; পরিষ্কার হয়ে গেলে সেই অসম্পূর্ণ নিবগুলোকে গোলাকার পাত্রে ভর্তি করা হয়। সেই গোলাকার পাত্রকে আবার আরও বড় গোলাকার পাত্রে আবদ্ধ করে কাঠ-কয়লার গুঁড়া দিয়ে আবৃত করে দেয় এবং সব সমেত সেগুলোকে লোহার বাক্সে পুরে জলন্ত চুল্লীতে দেওয়া হয়। আগুনের তাপে নিবগুলো ঈষৎ লাল হয়ে উঠলেই আবার ঠাণ্ডা করতে দেয়। ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর 'ডাই' এবং 'পাঞ্চিঙ-'এর ব্যবস্থা সমন্বিত স্ক্রু-প্রেসের সাহায্যে নিবগুলোকে যথাযথ আকারে পরিণত করা হয়। এরপরে সেগুলোকে আবদ্ধ পাত্রে রেখে চুল্লীতে পুড়িয়ে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। এর ফলে নিবগুলো খুব শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু শক্ত হবার ফলে ভংগপ্রবণ হয়ে পড়ে। ভংগপ্রবণতা দূর করবার জন্যে সেগুলোকে সোডার জলে সিদ্ধ করবার পর লোহার সিলিণ্ডারের মধ্যে রেখে কাঠ-কয়লার আগুনের উপর ঘোরান হয়। এরপরে যন্ত্র সহযোগে অনেকবার ঘষামাজার পর নিবগুলো রূপার মত সাদা এবং চক্চকে হয়ে ওঠে। চক্চকে হয়ে যাবার পর নিবের চোখ থেকে ডগা পর্যন্ত অংশটাকে ঘষে দেওয়া হয়।

নিবের মাথা চেরা হয় কেন ?

মাথা চেরা না হলে নিবের মধ্যে বেশি কালি থাকে না, এবং লেখবার সময় কলমের ডগা থেকে কালিও সমানভাবে প্রবাহিত হয় না। যদি নিবের ছেঁদা না থাকতো বা ডগা চেরা না হতো তবে সহজে লেখাই সম্ভব হতো না। নিবের

মাথা চিরে দেওয়া হল সর্বশেষ প্রক্রিয়া। কাটিং প্রেসের সাহায্যে মাথা চেরা হয়। চেরবার পর নিবগুলোকে আবার পালিশ করতে হয়, কারণ চেরার ধারগুলো মসৃণ না করলে কলমের ডগায় কালি সহজে প্রবাহিত হয় না। এরপরে নিবগুলোকে রং করে ভার্নিশ অথবা ল্যাকার করা হয়।

যদি ল্যাকার করতে হয় তবে নিবগুলোকে গালার সলিউশনে ডুবিয়ে নিয়ে ঘূর্ণায়মান সিলিণ্ডারের মধ্যে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকিয়ে গেলে নিবগুলোকে লোহার ট্রের উপর ছড়িয়ে দিয়ে চুল্লীর মধ্যে দেওয়া হয়। উত্তাপ দেওয়ার ফলে নিবের গায়ে গালা সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর নিবগুলোকে বাছাই করে খারাপগুলো ফেলে দিয়ে ভালগুলোকে প্যাকেটে ভর্তি করে বিক্রয়ের জন্য বাজারে চালান দেওয়া হয়।

রচনাকাল, ১৯৪৮

৭ আকস্মিক আবিষ্কার

প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ চিন্তা করে, গবেষণা করে অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে। কিন্তু কোন কিছু চিন্তা বা গবেষণা ব্যতিরেকেই আকস্মিকভাবে এমন বহু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

তোমরা অনেকে হয়তো জান, স্যাকারিন নামে সাদা একটা দানাদার জিনিস চিনির চেয়ে প্রায় পাঁচ-শ পঞ্চাশ গুণ বেশি মিষ্টি। এক গ্লাস জলে সামান্য একটু স্যাকারিন ফেলে দিলেই জলটা মিষ্টি হয়ে যায় ; কিন্তু পরিমাণে একটু বেশি হলেই জলটা তেতো লাগে। গুড়, চিনি প্রভৃতির পরিবর্তে স্যাকারিন ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু এর কোন খাদ্য বা পুষ্টিগুণ নেই। যা হোক, এই স্যাকারিন আবিষ্কৃত হয়েছিল আকস্মিকভাবে। আবিষ্কারের পূর্বে কেউ ধারণাও করে নি যে, চিনির চেয়ে এরূপ অসম্ভব রকমের মিষ্টি কোন পদার্থ থাকতে পারে।

ফালবার্গ নামে এক তরুণ রসায়ন-বিজ্ঞানী জন হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আলকাত্‌রা থেকে পাওয়া টলুইন নিয়ে একটা পরীক্ষা করছিলেন, কিন্তু বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও সাফল্য লাভ হচ্ছিল না। বিফলতার কারণ বুঝতে না পেরে ক্লান্ত-ভাবে একদিন তিনি ঘরে ফিরে এসে গৃহকর্ত্রীকে কিছু খাবার দিতে বললেন। খাবার খেয়ে তক্ষুনি আবার লেবরেটরীতে যেতে হবে। খাবার আনা হলে তিনি

সেই খালি হাতেই খাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু এ কি ব্যাপার! চা, রুটি যা মুখে দেন—প্রত্যেকটাই অসম্ভব রকম মিষ্টি। মিষ্টি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না—তাতে আবার এত বেশি মিষ্টি! গৃহকর্ত্রীকে রাগতস্বরে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন যে, তিনি তাতে মোটেই মিষ্টি দেন নি।

তবে কি তাঁর নিজের হাতেই কোন মিষ্টি জিনিস লেগে রয়েছে?—এই ভেবে তিনি হাতের আঙ্গুল মুখে দিয়ে দেখলেন -সত্যই তো আঙ্গুল অসম্ভব মিষ্টি লাগছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে গেলেন লেবরেটরীতে। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট যেসব রাসায়নিক পদার্থ টেবিলের উপর ছিল, সেগুলিকে একে একে পরীক্ষা করে একটির মধ্যে মিষ্টির স্বাদ পাওয়া গেল। এর ফলেই আবিষ্কৃত হলো স্যাকারিন।

আর একটা আকস্মিক আবিষ্কারের কথা বলছি। আজকাল সেলুলয়েড বা ব্যাকেলাইটের জিনিসের মত অথচ সেগুলির চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বল নানা রঙের চায়ের পেয়ালা, গেলাস, বাটি, ফাউণ্টেন পেন, ছাতার বাঁট, চিরুণী ও নানারকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে। এগুলি কি থেকে তৈরি হয়—জান? এগুলি তৈরি হয় দুধ থেকে কেজিন বা ছানা তৈরি করে, সেই ছানা দিয়েই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই জিনিসগুলি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু দুধের ছানা থেকে যে এরূপ জিনিস তৈরি হতে পারে, তা কেমন করে আবিষ্কৃত হলো—জান? এটাও একটা আকস্মিক আবিষ্কার!

একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে কাজ করছিলেন। টেবিলের উপর একটা পাত্রের মধ্যে বেশ খানিকটা চিজ (পনির) রাখা ছিল। পনির অর্থাৎ চিজ যে ছানা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা বোধ হয় তোমরা সবাই জান! হঠাৎ টেবিলের উপর একটা বিড়াল এসে পড়লো। বিজ্ঞানীও সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করলেন বিড়ালটাকে। তাড়া খেয়ে বিড়ালটা লাফিয়ে পালিয়ে যাবার সময় একটা বোতল উল্টে গিয়ে ভেঙে পড়লো ঐ চিজের পাত্রটার উপর। তখন কিছু বোঝা যায় নি। বোঝা গেল অনেকক্ষণ পরে, যখন দেখা গেল—পাত্রটার মধ্যে চিজের পরিবর্তে রয়েছে হাতির দাঁতের মত শক্ত একটা সাদা জিনিস।

কি হলো? দেখা গেল, ওই উল্টে-পড়া বোতলটার মধ্যে ছিল—ফরম্যালডি-হাইড। ফর্ম্যালডিহাইড পাত্রের পনির অর্থাৎ কেজিনের সঙ্গে মিশে তাকে সাদা শক্ত জিনিসে পরিবর্তিত করেছে। এ থেকেই গড়ে উঠেছে এই নূতন শিল্প।

৮ আবিষ্কারের কাহিনী—উড়োজাহাজ

উড়োজাহাজ বলতে বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা ও বাতাসের চেয়ে ভারী—এই উভয় রকমের উড়ন যন্ত্রকেই বোঝায়। বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা উড়ন-যন্ত্র হলো বেলুন, ডিরিজিবল, এয়ারশিপ ইত্যাদি। আর বাতাসের চেয়ে ভারী উড়ন-যন্ত্র হলো বিমান, এরোপ্লেন, উড়ন্ত কেল্লা ইত্যাদি। আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্যে মানুষ প্রথম থেকেই বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু গ্লাইডার ছাড়া আর কিছু উদ্ভাবন করতে পারে নি। কেউ কেউ হাল্‌কা গোলকের সাহায্যে আকাশে ওঠবার কল্পনা করলেও সেটা ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব—কল্পনা মাত্র। বেলুনের সাহায্যে আকাশে ওঠবার কথা কারোরই মাথায় আসে নি। পাখির মত ডানা মেলে গ্লাইডারের সাহায্যে আকাশে বিচরণের কথাই সবাই চিন্তা করছিলেন। কিন্তু যত উন্নত ধরনেরই হোক না কেন, গ্লাইডারে চেপে উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়ে হাঁস-মুরগীর মত কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকা যায় মাত্র—আকাশে ওড়া যায় না।

অবশেষে সত্য সত্যই আকাশে ওড়া সম্ভব হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যোসেফ মঁগোলফিয়ে এবং এটনে মঁগোলফিয়ে নামে দুজন ফরাসী যুবকের চেষ্টায় প্রথম বেলুন আকাশে উঠলো। এঁরা ছিলেন দুই ভাই। ছোটবেলায় খেলাচ্ছলে বড় একটা কাগজের ঠোঙার খোলা মুখটা উনুনের উপর ধরতেই ঠোঙাটা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল। সেটা লাফিয়ে উঠে সিলিং-এ গিয়ে ঠেকলো। দুই ভাই তো ব্যাপার দেখে অবাক! তবে তো এভাবেই আকাশে ওঠা যায়!—তাঁরা ভাবতে লাগলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্যারাসুটের সাহায্যে উপর থেকে লাফানোর ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন যোসেফের নজর পড়লো একটা ঝুলনো শার্টের উপর। শার্টটা ঝুলছিল খানিকটা উপরে, উনুনের পাশেই। উনুনের গরম ধোঁয়া ঢুকে মাঝে মাঝে সেটা ফুলে ফুলে উঠছিল।

এই ব্যাপার দেখেই বেলুন তৈরির কথা তাঁদের মনে ওঠে। দুই ভাই মিলে কাগজ দিয়ে বেলুন তৈরি করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ সালে কাপড় দিয়ে একটা বেশ বড় বেলুন তৈরি হলো। বেলুনের নিচে ঝোলানো একটা লোহার ঝুড়িতে খড়কুটা ভর্তি করে আগুন জ্বালিয়ে দিতেই অজস্র ধোঁয়া উঠে বেলুনের ভিতর ঢুকতে লাগলো। দেখতে দেখতে বেলুনটা ফুলে উঠে বিরাট আকৃতি ধারণ করলো। তামাশা দেখবার জন্যে বহুলোক জমায়েৎ হয়েছিল।

ছেড়ে দেওয়া মাত্রই বেলুনটা সকলের চোখের সামনে শাঁ শাঁ করে উপরে উঠে মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল। প্রায় সাত হাজার ফুট উপরে উঠে মিনিট কয়েক পরে প্রায় দেড় মাইল দূরে বেলুনটা আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে পড়লো।

এ খবর ছাড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থানে বেলুন ওড়াবার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স বিরাট একটা বেলুন তৈরি করে তাতে হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভর্তি করে ছেড়ে দেওয়া মাত্রই উপরে উঠে গিয়ে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ৪৪ মিনিট পরে সেটা ১৫ মাইল দূরে একটা মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে আর হাওয়া লেগে বিচিত্র ভঙ্গীতে এদিক-ওদিক দোল খেতে থাকে। স্থানীয় কৃষকেরা এই অদ্ভুত আকৃতির বস্তুটাকে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখে সেটাকে দানো বা দৈত্য বলে ভেবেছিল। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে মাঠটাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না দেখে একজন সাহসী লোক এগিয়ে এসে সেটাকে গুলি করে। গুলির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে বেলুনটা চুপ্‌সে গেল। তারা তখন সেটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে দিয়ে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এলো।

ঐ বছরেই ফ্রান্সের রাজা ও রাণীর উপস্থিতিতে একটা ভেড়া, একটা হাঁস ও একটা মুরগীকে বেলুনে করে আকাশে পাঠানো হয়। বেলুনটা প্রায় দেড় হাজার ফুট উপরে উঠে ধীরে ধীরে নেমে আসে। এই কয়টি প্রাণীই হলো প্রথম আকাশযাত্রী। এই বেলুন থেকেই ক্রমে ক্রমে ডিরিজিবল এবং গ্রাফজেপেলিন, হিণ্ডেনবুর্গ, আর-১০১ প্রভৃতি অতিকায় এয়ারশিপগুলোর আবির্ভাব ঘটেছিল।

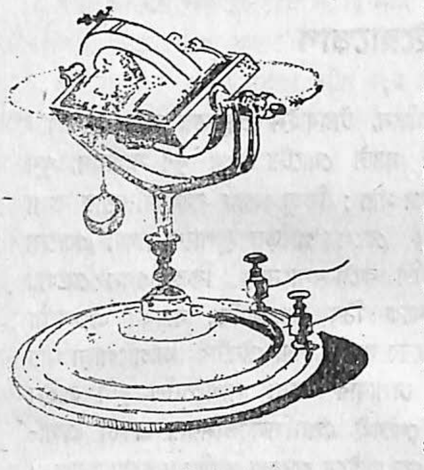
বেলুনে চড়ে মানুষ যখন ইচ্ছামত আকাশে বিচরণ করছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্লাইডার থেকে সর্বপ্রথম এরোপ্লেনের আবিষ্কার হয়। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর—অরভিল এবং উইলবার রাইট নামে আমেরিকার অধিবাসী দুই ভাই সর্বপ্রথম এরোপ্লেনে করে আকাশে ওঠেন। কিটিহকের মাঠে সেদিন বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে ওড়া দেখবার জন্যে তাঁরা অনেককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র পাঁচজন ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিত হন নি। অরভিলকে নিয়ে প্রবল বাতাসের মধ্যেই প্লেনখানা আকাশে উঠে গেল এবং মাত্র বারো সেকেণ্ডে ৫৪০ গজ উড়ে গিয়ে ভূমিতে অবতরণ করলো। এরপর উইলবার প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করে প্রবল বাতাসের ধাক্কায় প্লেন সমেত পড়ে যান। এরপর ক্রমে ক্রমে তাদের ওড়বার পাল্লা অনেকখানি বাড়িয়েছিলেন। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এরোপ্লেনের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এর অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এখন শতাধিক যাত্রী নিয়ে জেট-বিমান শব্দের চেয়েও দ্রুততর গতিতে সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে যাচ্ছে।

৭ জাইরোস্কোপ

এর আগে তোমাদিগকে স্টীম এঞ্জিন, টারবাইন প্রভৃতির কথা বলেছি। এবার একটা অদ্ভুত যন্ত্রের কথা বলবো। যন্ত্রটা মোটের উপর খুব সাধারণ, খুব ভারী সামান্য একটা নীরেট লোহার চাকা মাত্র ; কিন্তু তার কার্যকারিতার কথা শুনলে তোমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। রেলের গাড়ির দুপাশে চাকা, এজন্যে রেলের লাইন থাকে দুটা, বরাবর পাশাপাশি করে বসানো। কিন্তু এমন রেলের গাড়িও আছে যাদের দুপাশে চাকা না থেকে ঠিক মাঝামাঝি, বরাবর একসারি চাকার উপরেই চলতে হয়। সাধারণ ট্রেনের মতই লম্বা ট্রেনটার আগাগোড়া মাত্র এক লাইন চাকা। কাজেই এই ট্রেন চালাবার জন্যে পাশাপাশি দুটা লাইন পাতবার দরকার হয় না। অনেককাল থেকেই পেনসিলভেনিয়ার একটা জলা-ভূমির উপর দিয়ে প্রায় শ'খানেক মাইল এক লাইনে রেলের গাড়ি চলাচল করছে। এছাড়া আরও অন্যান্য জায়গায় এক লাইনের রেল গাড়ির প্রচলন আছে। যাহোক, তোমরা বোধহয় ভাবছ—এটা হতেই পারে না—একটা মাত্র লাইনের উপর দিয়ে এত বড় বোঝাই রেলের গাড়ি কেমন করে চলতে পারে? সাধারণ যে রেলের গাড়ির সংগে তোমরা পরিচিত সে গাড়ির পক্ষে একটা মাত্র লাইনের উপর দিয়ে চলা সম্ভব নয়—একথা ঠিক। কিন্তু যে রেল গাড়ির কথা বলছি সেটা চলে অদ্ভুত একরকম যন্ত্রের সহায়তায়। সেই অদ্ভুত যন্ত্রটার নামই—জাইরোস্কোপ। জইরোস্কোপ অনেকটা মানুষের মস্তিষ্কের মতই কাজ করে। যন্ত্রটা যেন প্রয়োজন-মত যথাযোগ্য কাজ করে যায়। চল্‌তি অবস্থায় গাড়িটা না হয় বাইসাইকেলের মত খাড়া থাকতে পারে, কিন্তু যখন থামে তখন তো কাৎ হয়ে পড়বার কথা। কিন্তু স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়ও ট্রেনটা ঠিক খাড়া ভাবেই থাকে—গাড়ির মধ্যেকার জাইরোস্কোপই তাকে 'ব্যালান্স' করে খাড়া রাখে। মত্‌লব করে যদি অনেক লোক এক সঙ্গে এক দিক দিয়ে গাড়িতে ওঠে বা মালপত্র চাপাবার চেষ্টা করে, তবুও ট্রেনখানাকে সেদিকে কাৎ করে ফেলবার উপায় নেই। একদিকে ভার বেশি হলে অন্যদিকে ভার চাপিয়ে যেমন পাল্লার দাঁড়ি সমান রাখা যায়, জাইরোস্কোপও তেমনি ট্রেনের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

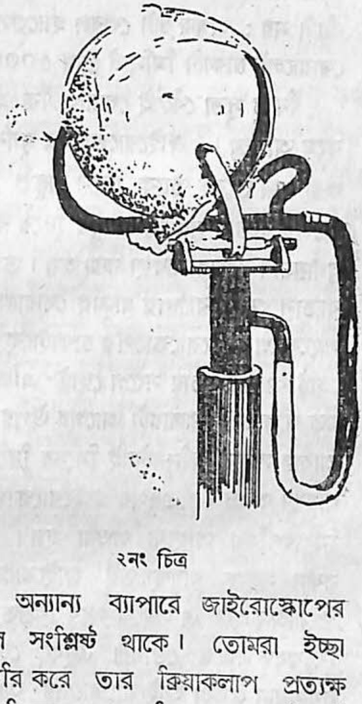
টর্পেডোর কথা শুনেছ তো? গেল দুই দুটো মহাযুদ্ধে কত বড় বড় জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে—সেকথা কারো অজানা নেই। এই টর্পেডো একটা অদ্ভুত যন্ত্র। যন্ত্রটার চেহারা একটা প্রকাণ্ড বর্মা-চুরুটের মত। অবশ্য

কতকগুলো আবার সোজা নলের মত করেও তৈরি হয়। টর্পেডোর ভিতরে যে কত কল-কৌশল, কত জটিল যন্ত্র-পাতি বসানো থাকে তা' শুনলে তোমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। যদি তোমাদের জানবার আগ্রহ জাগে তবে টর্পেডোর কথা পরে জানাব। এখন জাইরোস্কোপের কথাই বলি। কোন জাহাজকে ঘায়েল করতে হলে তার দিকে ডুবো-জাহাজ থেকে টর্পেডো ছোঁড়া হয় অনেক দূর থেকে। উচ্চ-চাপের বায়ু চালিত এঞ্জিনের সাহায্যে প্রোপেলার ঘুরিয়ে টর্পেডো জলের নিচ দিয়ে ছোটে অসম্ভব দ্রুতগতিতে। একে জাহাজ চলন্ত, তাতে জলের স্রোত ও জলের ঢেউ আছে। এ অবস্থায় দূর থেকে লক্ষ্য-বস্তুকে ঠিক জায়গা মত আঘাত করা খুবই শক্ত ব্যাপার। ডুবো জাহাজ থেকে টর্পেডো ছোঁড়া হয়, খুব হিসাব করে। টর্পেডো এই হিসাব মতো ঠিক পথে চলে ; হঠাৎ একটা ঢেউই আসুক বা স্রোতের চাপই লাগুক, টর্পেডোকে কিছুতেই তার নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচলিত করা যাবে না। এটাই হলো টর্পেডোর বিশেষত্ব। জাইরোস্কোপের সাহায্যেই এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে।


জাইরোস্কোপ

দিকনির্ণয়ের জন্যে চুম্বক কম্পাস ব্যবহৃত হ'ত। দেখা গেছে নানাকারণে চুম্বক কম্পাস সব সময়ে সঠিক নির্দেশ দেয় না। জাইরো-কম্পাস কিন্তু একেবারে নির্ভুল। গেল যুদ্ধে জার্মানরা ইংল্যাণ্ডের উপর অনেক উড়ন্ত বোমা ফেলেছিল। বোমাগুলো ডানাওয়ালা ছোট এরোপ্লেনের মত। চালকশূন্য এরোপ্লেনের মত এই বোমাগুলো জাইরোস্কোপের সাহায্যে নির্ধারিত দিকে লক্ষ্য বস্তুর উপর পরিচালিত হতো। চালকবিহীন এরোপ্লেনের কথা শুনে থাকবে ; চালকবিহীন এরোপ্লেন পরিচালিত হয় জাইরোস্কোপের সাহায্যে। জাইরোস্কোপ সহযোগে আজকাল জাহাজেরও এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, চালক হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও জাহাজ তার নির্দিষ্ট পথেই চলতে থাকে। তাছাড়া তোমরা বোধহয় জাহাজের দোল খাওয়ার কথা শুনেছ - জাহাজের দোলন বন্ধ করবার জন্যে জাইরোস্কোপ বসানো থাকে। জাইরোস্কোপ কেমন করে এই অদ্ভুত কাজগুলো সম্পন্ন করে, বড় হয়ে পড়াশুনা করলে সহজেই সে কথা বুঝতে পারবে। তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে এস্থলে কেবল জাইরোস্কোপটা কি রকমের যন্ত্র এবং তার মোটামুটিভাবে আলোচনা করবো।

তোমাদের অনেকেই খেলনা লাট্টু ঘুরিয়েছো নিশ্চয়। লাট্টুর গায়ে সূতা বা লেত্তি জড়িয়ে জোরে ছুঁড়ে দিলেই লাট্টু তার আলের উপর ঘুরতে থাকে লাট্টুর আলটা উপরে নিচে দু'দিকেই খানিকটা বের করা থাকতে পারে। লাট্টুর ঠিক মধ্য দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করা আলটাকে বলা হয়—অক্ষদণ্ড। অক্ষদণ্ড কথাটা বুঝে রেখ, কারণ একথাটা পরে আরও ব্যবহার করা দরকার হবে। যাহোক তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ—ঘুরন্ত লাট্টুকে যদি কৌশলে আঙুলের ডগার বা ঝুলানো সূতোর উপর তুলে দেওয়া যায়, সেখানেও তার আল বা অক্ষদণ্ডের উপর ঘুরতে থাকে। একদিকে একটু চাপ বা ধাক্কা দিলেও সে তার টাল সামলে নেয়। অবশ্য ঘূর্ণনবেগ কমে গেলে কাৎ হয়ে পড়ে যায়। এই লাট্টুই হলো—জাইরোস্কোপের প্রথম সংস্করণ। জাইরোস্কোপ ও লাট্টুর মধ্যে কেবল এটুকু পার্থক্য যে, জাইরোস্কোপ বৈজ্ঞানিক কৌশলে নিখুঁৎভাবে তৈরি কিন্তু সাধারণ লাট্টু সেরূপ নিখুঁৎ নয়।



২নং চিত্র

অবশ্য চালকবিহীন এরোপ্লেন, জাহাজ বা অন্যান্য ব্যাপারে জাইরোস্কোপের সংগে অনেক রকমের জটিল কলা-কৌশল সংশ্লিষ্ট থাকে। তোমরা ইচ্ছা করলে নিজেরাই খেলনা জাইরোস্কোপ তৈরি করে তার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পার। ১নং ছবি থেকে জাইরোস্কোপ কিরকম তার হদিস পাবে। নিরেট এবং নিখুঁৎ একটা ভারী চাকার অক্ষদণ্ডের দু'দিকের সূঁচালো মুখ দুটো চেপটা একটা বলয় বা রিঙের মধ্যে আলতোভাবে বসানো। এই প্রথম রিং বা বলয়টা অপেক্ষাকৃত বড় আর একটা রিঙের মধ্যে চাকার অক্ষদণ্ডের সমকোণে আলের উপর ঘুরতে পারে। এই দ্বিতীয় রিংটাও আবার দুটো আলের উপর আলতোভাবে বসানো। ফলে এই দাঁড়ায় যে, ভারী চাকাটা প্রথম রিঙের মধ্যে যেমন ঘুরতে পারে, প্রথম রিংটাও তেমনি দ্বিতীয় রিঙের মধ্যে এবং দ্বিতীয় রিং আবার তৃতীয় রিঙের আলের উপর ঘুরে যেতে পারে। চাকার অক্ষদণ্ডের একদিকে ছোট্ট একটা ছেঁদা করে তার সংগে খানিকটা লম্বা সূতার একমুখ বেঁধে দাও। চাকাটাকে একটু ঘুরিয়ে সূতাটা কয়েক প্যাঁচ জড়িয়ে একটু জোরে টেনে ছেড়ে দিলেই দেখবে, চাকাটা অসম্ভব বেগে রিঙের মধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ জিনিসটাকে একটা পেন্সিলের ডগায়ই হোক বা টাঙানো একগাছা সূতার উপরেই হোক, যেকোন জায়গায় ছেড়ে দিলেই দেখবে সেটা লাট্টুর মতই খাড়া, শয়ান

অথবা কাৎ হয়ে স্থিরভাবে ঘুরছে। ঘূর্ণন-বেগ কমে গেলে অবশ্য একদিকে পড়ে যাবে। ২নং চিত্রে জাইরোস্কোপ একটা মাত্র রিঙের মধ্যে বসানো আছে। ভারী চাকা হলে সূতা বেঁধে ঘোরানো সম্ভব নয়, তাই ওরকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রিংটা বাঁ-দিকের স্ট্যাণ্ডের সংগে এমনভাবে সংলগ্ন যে, অনায়াসেই উপরে বা নিচের দিকে ওঠানামা করতে পারে। রিঙের ডানদিকের অংশটা স্ট্যাণ্ডের গায়ে আঁটা নয়; অক্ষদণ্ডটা কেবল হ্যাণ্ডেল সংযুক্ত চাকাটার উপর স্থাপিত। হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই চাকাটা মিনিটে প্রায় ৫০০০ বার করে পাক খেতে থাকে।

কিন্তু সূতা বেঁধেই ঘোরাও, কি হাতেই ঘোরাও কিছুক্ষণ বাদেই তার ঘূর্ণনবেগ কমে আসবে। জাইরোস্কোপের ঘূর্ণনবেগ যদি বরাবর সমান রাখবার কোন ব্যবস্থা করা যায় তবেই তাকে দিয়ে অদ্ভুত কাজ করানো যেতে পারে। প্রথমত উচ্চ চাপের বাতাস সরু নলের মুখ দিয়ে বার করে তার ধাক্কায় জাইরোস্কোপকে অনবরত ঘূর্ণায়মান রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর আবার নিখুঁৎ গোলাকার কাগজের বলকে বাতাস অথবা বাষ্পের ধাক্কায় ঘোরাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর পরে স্টীম এঞ্জিন সহযোগে জাইরোস্কোপের চাকাটাকে নির্দিষ্ট বেগে ঘূর্ণায়মান রাখার ব্যবস্থা হয়। ছোট্ট বয়লার, তার সংগে ছোট্ট এঞ্জিনের সাহায্যে ফ্লাই-হুইলটাই জাইরোস্কোপের মত ঘুরছে। বয়লারটা আলের উপর বসানো, কাজেই এদিক-ওদিক ঘুরতে পারে। আবার সমস্ত জিনিসটারই নিচের দিকে একটা আলের উপর ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরবার ব্যবস্থা আছে। এরপর জাইরোস্কোপকে নির্দিষ্ট বেগে ঘূর্ণায়মান রাখবার জন্যে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্য লওয়া হয়। বিদ্যুৎশক্তিতে যেমন করে মোটর ঘোরে সে রকম সহজ ব্যবস্থাতেই জাইরোস্কোপ ঘোরাবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। প্রয়োজন হলে এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। তবে জাইরোস্কোপের বিশেষত্ব সম্বন্ধে তোমরা এটুকু জেনে রাখ যে, নির্দিষ্ট গতিতে এরূপ অনবরত ঘূর্ণায়মান একটা জাইরোস্কোপের অক্ষদণ্ডটাকে যদি সূর্যোদয়ের সংগে সূর্যের দিকে মুখ করে রেখে দাও—তবে দেখবে—অক্ষদণ্ডটা সারাদিন সূর্যের দিকে মুখ করেই আছে, বেলা বাড়বার সংগে সূর্য যত উপরে উঠতে থাকবে অক্ষদণ্ডটাও তত খাড়া হতে থাকবে। তোমরা হয়তো মনে করতে পার জাইরোস্কোপের অক্ষদণ্ডটা বরাবর ঘুরে যাচ্ছে। তা মোটেই নয়। অক্ষদণ্ডটা সূর্যের দিকে ঠিকই আছে, কেবল পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে বলে এরূপ দেখাচ্ছে। অক্ষদণ্ডটাকে সূর্যের দিকে না রেখে উত্তর আকাশের ধ্রুবতারার দিকে নিশানা করে রাখ। দেখবে, সারা দিন অক্ষদণ্ডের মুখ সেই এক দিকেই আছে। কেন এমন হয়? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। মোটের উপর, জাইরোস্কোপের অক্ষদণ্ডের মুখ যেদিক করে রাখা যায় ঠিক সেদিকেই থাকে। এই ব্যাপারের জন্যেই একে দিয়ে চালকবিহীন এরোপ্লেন, জাহাজ, টর্পেডো চালানো এবং আরও অনেক কিছু অদ্ভুত কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

রচনাকাল, ১৯৪৮

১০ সিন্‌ক্রোট্রন

পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান, পরমাণুর অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তির কথা বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই জানতেন। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে মাত্র অল্প কিছু-কাল পূর্বে তাঁরা সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পেরেছেন। অ্যাটম বোমাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতদিনের সাধনার ফলে মানুষ আজ পরমাণু জগতে প্রবেশ করেছে। অবশ্য এই প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে তারা ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে না পারলে কেবল ধ্বংসকার্যে ব্যবহার করেই শক্তি আহরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই আজ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এই শক্তিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করবার জন্যে ব্যাপক-ভাবে চেষ্টা চলছে। সকলেই জানেন পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ যাকে আমরা পরমাণু বলি, সেগুলো ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কতকগুলো মৌলিক কণিকার সমবায়ে গঠিত। যেমন ইউরেনিয়াম একটা মৌলিক পদার্থ। ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর পরমাণুর বাইরের দিকে আছে ৯২টা ইলেকট্রন। আর এর ভিতরের কেন্দ্রীয়বস্তু অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা ৯২টা প্রোটন এবং ১৪৩টা নিউট্রন কণিকার সমবায়ে গঠিত। এই কণিকাগুলোর মধ্যে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে মারতে পারলে পরমাণুকে ভেঙে ফেলা যেতে পারে, অবশ্য ঢিল যদি ঠিক মত জায়গায় আঘাত করে। পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থটাকে ভেঙে ফেলতে পারলে পদার্থের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। পরমাণুর উপাদান বিভিন্ন কণিকাগুলোকে ঢিল বা বুলেটের মত ব্যবহার করে পরমাণু ভাঙবার ব্যবস্থা অনেকদিন ধরেই চলছিল। এরূপ সাধারণ ঢিল ছোঁড়ার ব্যবস্থায় ইলেকট্রনগুলোকে পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু পরমাণুর ভিতরকার কেন্দ্রীয়বস্তু অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটাকে ভাঙাই শক্ত। পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তুটাকে ভাঙতে না পারলে পদার্থের রূপান্তর ঘটে না এবং ভিতরকার সংহত শক্তিকেও বা'র করা চলে না। যেসব মৌলিক কণাগুলোকে বুলেটের মত ব্যবহার করা হয় তাদের গতিবেগ অসম্ভবরূপে বাড়িয়ে তুলতে পারলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টাই হয়েছে। সর্বশেষে ডঃ লরেন্স বহুদিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সাইক্লোট্রন নামে অদ্ভুত এক বিরাট যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

একটা ঢিল হাতে করে যত জোরে ছোঁড়া যায়—লম্বা একটা দড়ির প্রান্তে

বেঁধে ঢিলটাকে কিছুক্ষণ ঘোরাবার মুখে হঠাৎ ছেড়ে দিলে বেশি শক্তি অর্জনের ফলে তার গতিবেগ অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। দড়ি বাঁধা ঢিলের মত না হলেও কতকটা ওই ধরনে, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির সহায়তায় সাইক্লোট্রন, বুলেটরূপে ব্যবহৃত কণাগুলোর গতিবেগ অসম্ভবরূপে বাড়িয়ে তোলে। ঠিক তাগ মাফিক লাগাতে পারলে এই বেগবান কণাগুলো যে কোন পদার্থের পরমাণুকে আঘাত করে ভেঙে ফেলতে পারে। সাইক্লোট্রনের সাহায্যে প্রোটন, ডয়টারন প্রভৃতি ধন-তড়িতাবিষ্ট কণাগুলো বিশ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের মত শক্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু এই কণাগুলোর বস্তুপরিমাণ বা ভর অনেক বেশি। কাজেই গতিবেগ খুব বেশি বাড়ে না। এজন্যেই বিজ্ঞানীরা এরূপ বুলেটের গতি আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে নতুন উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। ফলে, অনেকদিন থেকেই বিটাট্রন যন্ত্র তৈরির কথা তাদের মনে উদিত হয়েছিল। অবশেষে ডঃ ওয়াল্টন, বিটাট্রন তৈরি করবার কার্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৯৪৩ সালে ইলিনয়েসের প্রোফেসর কার্স্টের উদ্যোগে ১০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের বিটাট্রন যন্ত্রের নির্মাণকার্য শেষ হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালে প্রোফেসর কার্স্ট ২৫৯ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের আর একটি বিটাট্রন নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। পরে জানা গেছে, জার্মান বিজ্ঞানীরা নাকি তার আগেই বিটাট্রনের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের আণবিক গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন। সাইক্লোট্রনে যেমন ধন-তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলোর গতিবেগ বৃদ্ধি করা হয়, বিটাট্রনে সেরূপ ঋণ-তড়িতাবিষ্ট বিটাকণিকা অর্থাৎ ইলেকট্রনের গতিবেগ বাড়িয়ে তোলা হয়।

এক ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন বিটা-কণিকা সেকেণ্ডে ৩৭০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। ১০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন কণিকাগুলো সেকেণ্ডে প্রায় ৩৭০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে। ভোল্টেজ আরও বাড়িয়ে দিলে গতিবেগ কিন্তু ঐ অনুপাতে অসম্ভব রূপে বাড়ে না, তবে ক্রমশঃ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি যেতে পারে। আলোর গতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। মিলিয়ন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের শতকরা ৯৫ ভাগ অর্জন করতে পারে। কারণ অধিকতর শক্তি বৃদ্ধিতে ইলেকট্রন কণিকাগুলোর গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি যাওয়ার সংগে সংগেই তাদের 'মাস্' অর্থাৎ ভর বেড়ে যায়। আগেই বলেছি সাইক্লোট্রনে ধন তড়িতাবিষ্ট কণিকার গতিবেগ বাড়িয়ে তোলা হয়। কিন্তু এই কণিকাগুলোর ভর বেশি বলে ২০,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি প্রয়োগেও গতিবেগ বেশি বাড়তে পারে না।

কাজেই ইলেকট্রন বুলেটগুলোর গতিবেগ আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে বিজ্ঞানীরা এক নতুন রকমের যন্ত্র তৈরি করবার পরিকল্পনা করেন। এই যন্ত্রের

নাম সিনক্রোট্রন। বিটাট্রন এবং সাইক্লোট্রন, এই উভয় যন্ত্রের মূলসূত্রের সমন্বয়ে মিচিগান ইউনিভার্সিটিতে এরূপ একটা বিরাট যন্ত্র তৈরি হয়েছে। নির্মাণ পরিকল্পনাকারী বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'রেস্‌ট্র্যাক'।

এই যন্ত্র সাহায্যে বিটা-কণিকা অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলোকে তিনশ' মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং তাদের গতিবেগ বাড়বে প্রায় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি। মোটের উপর এগুলো হবে অপেক্ষাকৃত মৃদুগতি-সম্পন্ন ব্যোম-রশ্মির মত। এরূপ প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন বুলেটের আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তু তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হবেই অধিকন্তু পরমাণুর উপাদান, মৌলিক কণিকাগুলোও হয়তো রেহাই পাবে না। যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায়, বিটাট্রনের সাহায্যে মেসন নামক মৌলিক কণিকার উৎপাদন, তামাকে নিকেলে আর রূপাকে ক্যাডমিয়াম এবং প্যালাডিয়ামে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এখন সিন্‌ক্রোট্রন যে আরও কত কি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে তা' জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন।

রচনাকাল, ১৯৪৮

১১ প্রাচীন যুগের অতিকায় ঘণ্টা

ঘণ্টা জিনিসটা কি, সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। প্রাচীন আমলের এই অদ্ভুত শব্দোৎপাদক যন্ত্রটি আজও প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। পূজাপার্বণে ঘণ্টাধ্বনি অনুষ্ঠানের আঙ্গিক হিসাবে আজও অপরিহার্য। তবে প্রাচীন আমলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন বিশাল আকৃতির ঘণ্টা তৈরির রেওয়াজ ছিল আজকাল সেটা মোটেই নেই। বর্তমান কালে সঙ্কেত জ্ঞাপন বা সময় নির্দেশের উদ্দেশ্যে প্রাচীন আমলের ঘণ্টার কিছু কিছু প্রচলন থাকলেও এক মাত্র ফায়ারব্রিগেডের গাড়িতেই বোধহয় সেই সনাতন ঘণ্টার কার্যকরী ব্যবহার দেখা যায়।

যাহোক, কোন্ দেশে কে প্রথম ঘণ্টার উদ্ভাবন করেছিলেন, সেকথা জানা নেই ; তবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে কোন কোন দেশে ঘণ্টার প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিশরের প্রাচীন অধিবাসীরা অসিরিস দেবের উৎসবে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান শুরু করতো। প্রাচীন গ্রীক পুরোহিতেরাও উৎসবাদিতে ঘণ্টাধ্বনি করতেন। তাছাড়া গ্রীক সৈন্যদের দুর্গ ও ছাউনিতে ঘণ্টার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রোমানরা ঘণ্টাধ্বনি করে সূর্যোদয়ের সময় সকলকে জানিয়ে দিত। ইংল্যাণ্ডে নরম্যান রাজাদের রাজত্বকালে রাত্রির একটা নির্দিষ্ট সময়ে আলো এবং আগুন নিবিয়ে ফেলবার জন্যে ঘণ্টাধ্বনি করে সঙ্কেত দেওয়া হতো। এরই নাম ছিল কারফিউ বেল।

খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে উপাসনাকারীদের ভজনালয়ে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাবার জন্যে ঘণ্টার ব্যবহার শুরু হয়। ৬৮০ খৃস্টাব্দ থেকেই বোধহয় ইংল্যাণ্ডে ঘণ্টার প্রচলন হয়। অবশ্য সেগুলো ছিল হাতে-বাজানো ছোট ছোট ঘণ্টা। কিন্তু কখন থেকে অতিকায় ঘণ্টা তৈরির রেওয়াজ শুরু হয়, সেকথা সঠিক-ভাবে বলা যায় না। তবে খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতেই খুব সম্ভব বিরাট আকৃতির ঘণ্টার প্রচলন খুব বেশি হয়েছিল। ৪ ভাগ তামা ও একভাগ টিনের মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর ধাতু দিয়েই ঘণ্টা তৈরি হতো। প্রত্যেক ঘণ্টার আকৃতিই হতো চূড়াসমেত মন্দিরের গম্বুজের মত। ভিতরের দিক বা বাইরের দিক থেকে ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা থাকতো।

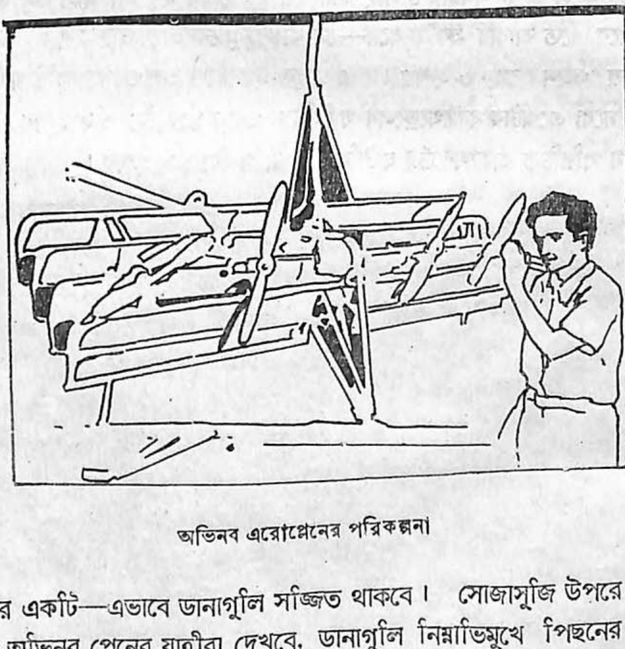
পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ঘণ্টাটি আছে রাশিয়ার মস্কো শহরে। এই অতিকায় ঘণ্টাটির নাম হচ্ছে জার কলোকল। এই বিরাট ঘণ্টাটি নাকি ১৬৫৩ খৃস্টাব্দে

ঢালাই করা হয়। ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে একটা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে ঝুলানো অবস্থা থেকে ঘণ্টাটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার ফলে সেটা ফেটে অকেজো হয়ে যায়। অনেককাল এভাবে মাটির উপরে পড়ে থাকবার পর ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে এই ঘণ্টার নিচের মাটি খুঁড়ে একটা গির্জা তৈরি করা হয় এবং বিরাট ঘণ্টাটি সেই ভূগর্ভস্থ গীর্জার গম্বুজ হিসাবে থেকে যায়। মস্কোতে অবশ্য ব্যবহারোপযোগী আরও একটা অতিকায় ঘণ্টা আছে। সেটা ঢালাই করা হয়েছিল ১৮১৭ খৃস্টাব্দে। এটা পুরাতন অকেজো ঘণ্টার কাছেই উঁচু একটা মঞ্চে ঝুলানো আছে। এটাকে বলা হয়—নিউ বেল। এটার ওজন ১২৫ টন। ব্রহ্মদেশের মিঙ্গুনেও ১২৫ টন ওজনের একটা অতিকায় ঘণ্টা আছে। চীনের পিকিন শহরেও একটা বড় ঘণ্টা আছে তবে তার ওজন অনেক কম—৫৩ টন মাত্র। তবে বৃহত্তর ঘণ্টা রাশিয়াতেই বেশি দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডের গ্রেট পল নামে ঘণ্টাটির ওজন ১৭ টন। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে এই ঘণ্টাটি ঢালাই করে সেণ্ট পল ক্যাথেড্রেলে ঝুলানো হয়! তাছাড়া লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্ট ভবনের ক্লক টাওয়ারের বিগ বেন নামক ঘণ্টাটিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে বিগ বেন ঢালাই করা হয়। প্রথমে এর ওজন ছিল ১৪ টন; কিন্তু ফাটলের ফলে একে পুনরায় ঢালাই করা হয়। তখন ২½ টন মাল কম হয়। কিছু কাল পরে এতে আবার ফাটল ধরে—সে অংশটুকু কেটে দেওয়া হয়। এই ঘণ্টার হাতুড়ির ওজন হচ্ছে ৬ হন্দর। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ডে আরও কয়েকটি ঘণ্টা আছে। তাদের মধ্যে এক্সেটার ক্যাথেড্রেলের ঘণ্টাটির ওজন ১১ টন ১২ হন্দর এবং গ্রেট টম নামে পরিচিত অক্সফোর্ডের ঘণ্টাটির ওজন ৭ টন ১২ হন্দর।

রচনাকাল, ১৯৪৮

১২ অভিনব এরোপ্লেনের পরিকল্পনা

তোমরা সবাই জান, এরোপ্লেন মাটি ছেড়ে সোজাসুজি খাড়াভাবে আকাশে উঠতে পারে না। আকাশে ওঠবার সময় মাটির উপর দিয়ে অনেকটা ছুটে যেতে হয়। নানা কারণেই সেটা অসুবিধাজনক। মাটি ছেড়ে খাড়াভাবে আকাশে উঠে যেতে পারে—এরকমের এরোপ্লেন তৈরি করবার জন্যে বিশেষজ্ঞেরা অনেক দিন থেকে চেষ্টা করে আসছিলেন। এর ফলে হেলিকপ্‌টার উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু হেলিকপ্‌টার আর এরোপ্লেনে তফাৎ অনেক। হেলিকপ্‌টারের সাহায্যে এরোপ্লেনের মত কাজ করা সম্ভব নয়। সে জন্যেই বিমান-বিশেষজ্ঞ যন্ত্রকুশলীরা এক নতুন ধরনের যাত্রীবাহী এরোপ্লেনের পরিকল্পনা করেছেন। এই প্লেনের উভয় পার্শ্বে, একটির



অভিনব এরোপ্লেনের পরিকল্পনা

উপর আর একটি—এভাবে ডানাগুলি সজ্জিত থাকবে। সোজাসুজি উপরে ওঠবার সময় এই অভিনব প্লেনের যাত্রীরা দেখবে, ডানাগুলি নিম্নাভিমুখে পিছনের দিকে গুটিয়ে গেছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে, প্লেনখানি মাটি থেকে ক্রমশঃ সোজাসুজি উপরে উঠে যাচ্ছে। নিচের দিকে তাকালে মনে হবে তারা যেন চৌকা স্ট্যাম্পের মত ছোট্ট একটি বিমান-ঘাঁটির উপর উড়ে বেড়াচ্ছে।

দেখতে দেখতে গুটানো ডানাগুলি ক্রমশঃ সমকোণে প্রসারিত হয়ে সাধারণ এরোপ্লেনের রূপ ধারণ করবে এবং শব্দগতিতে ছুটতে থাকবে। অপর পৃষ্ঠার ছবি থেকে এ-ধরনের এরোপ্লেন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবে।

খাড়াভাবে উপরে ওঠবার জন্যে বিশেষজ্ঞেরা অবশ্য অন্য এক রকম পরিকল্পনার বিষয়ও চিন্তা করছেন। এই পরিকল্পনায় এরোপ্লেনখানি যাত্রীদের তোলবার সময় মাটিতে লেজের উপর খাড়াভাবে অবস্থান করবে। যাত্রীরা ওঠবার পর প্লেনখানি সোজা খাড়াভাবেই আকাশে উঠে যাবে। উপরে ওঠবার পর যান্ত্রিক-কৌশলে আপনাআপনি সাধারণ এরোপ্লেনের মত শয়ানভাবে উপনীত হয়ে প্লেন-খানি ছুটতে থাকবে।

রচনাকাল, ১৯৫৩

১৩ অভিনব হেলিকপ্‌টার

আকাশ পথে অল্প দূরত্বের মধ্যে যাতায়াত ও যে কোন জায়গায় সোজাসুজি অবতরণের জন্যে আজকাল হেলিকপ্‌টারের ব্যবহার খুবই প্রচলিত হয়েছে। হেলিকপ্‌টারের সাহায্যে আকাশ পথে দেড়শ' থেকে তিনশ' মাইল অনায়াসেই ভ্রমণ করা যেতে পারে। পাখির মত একক আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্যে মানুষ অনেকদিন থেকেই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল। সম্প্রতি এককভাবে আকাশ-পথে বিচরণ করবার জন্যে হেলিকপ্‌টারেরই একরকম ক্ষুদে সংস্করণের মত হাল্কা যন্ত্রের উদ্ভাবনে তার আকাঙ্ক্ষা সাফল্য লাভ করতে চলেছে। একজন মানুষ বহন করবার উপযোগী এরূপ হাল্কা হেলিকপ্‌টার উদ্ভাবন করেছেন—রেমণ্ড হস্টেটর নামে একজন ফরাসী উদ্ভাবক। এতে উড্ডয়নকারীর পিঠের সঙ্গে মোটর সমেত একটা হাল্কা সাইকেলের কাঠামোটা এঁটে দেওয়া হয়। মোটরের সাহায্যে পাখা ঘোরে। এক গ্যালন জ্বালানীতে মোটরটি প্রায় ২ ঘণ্টা চলতে পারে। এতে এক সেট প্রধান মোটর ছাড়াও ধাক্কা বা টাল সামলাবার জন্যে আনুষঙ্গিক প্রোপেলারের ব্যবস্থা আছে। মোটর সাইকেলটির ওজন হবে প্রায় আধ মণ।



অভিনব হেলিকপ্‌টার

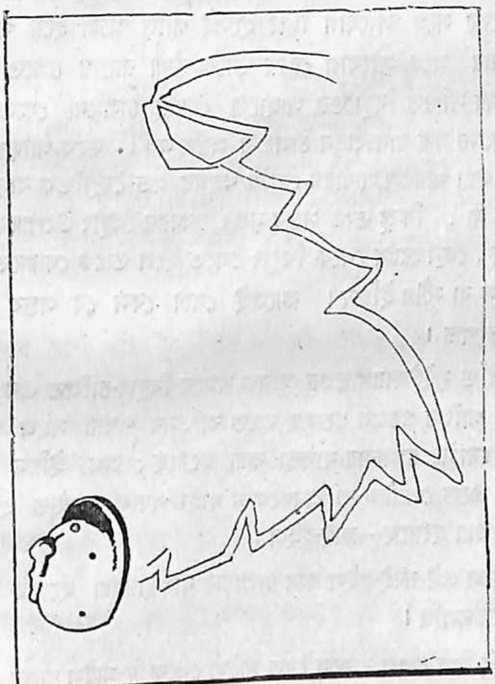
আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ সম্প্রতি আর একটি নূতন ধরনের হেলিকপ্‌টার তৈরি করেছেন। জটিলতা বর্জিত এই সরল গঠনের উড্ডয়ন যন্ত্রের নামকরণ হয়েছে—হপিকপ্‌টার। এই হপিকপ্‌টারের সাহায্যে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত একজন লোক কিছুদূর পর্যন্ত অনায়াসে আকাশে উড়ে গিয়ে তার ইচ্ছামত যে কোন স্থানে অবতরণ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ডেনিয়েল মারফি সম্প্রতি এই অভিনব যন্ত্রের পরীক্ষা দেখিয়েছেন। হপিকপ্‌টার তবে এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থাতেই রয়েছে। অবশ্য এর অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্যে চেষ্টা চলছে।

রচনাকাল, ১৯৫২

১৪ যান্ত্রিক-প্রাণী

মেসিনা স্পেকুলেট্রিক্স

যান্ত্রিক প্রাণী হচ্ছে প্রাণীর অনুকরণে তৈরি কচ্ছপের মত একটি জিনিস। এটার নাম হচ্ছে—মেসিনা স্পেকুলেট্রিক্স। এই নকল প্রাণীর খোলাটার ভিতরে দুটো ভ্যাকুয়াম টিউব, দুটো ছোট্ট মোটর, একটা ফটো-ইলেকট্রিক সেল এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। জীবনের বিশেষ লক্ষণই হচ্ছে আলো-ছায়া, বাধা-বিঘ্ন, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া। এই নকল প্রাণীটিও জীবন্ত



প্রাণীদের মতই বাইরের আঘাত-উত্তেজনায় সমভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। আলোতে আকৃষ্ট হয়ে এই নকল প্রাণীটা বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে অগ্রসর হবার পথে বাধার সম্মুখীন হওয়ার ফলে ঘুরে গিয়ে বাধা অতিক্রম করে। পুনরায় বাধার সম্মুখীন হয়ে ফের ঘুর পথে চলে। এরূপভাবে বার বার বাধা এড়িয়ে অবশেষে নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হয়।

রচনাকাল, ১৯৫১

১৫ ফ্লাই-হুইল বাস

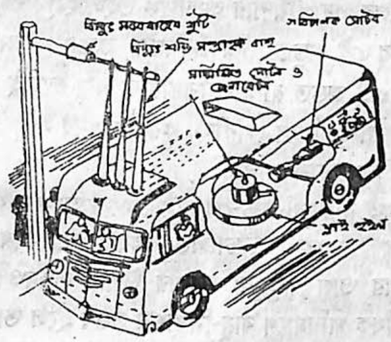
বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক মোটর প্রভৃতি সবাই তোমরা দেখেছ। বৈদ্যুতিক তার যোগ করে দিলেই মোটর চলতে থাকে। ট্রামগাড়ি চলে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে। সরবরাহ-কেন্দ্র থেকে উপরের তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে মোটর চালায়। তারের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হলেই গাড়ি অচল হয়ে পড়ে। কাজেই উপরের তারের সঙ্গে সংযোগ রেখে তাকে বাঁধা রাস্তায় চলতে হয়। অবশ্য স্টোরেজ সেলের সঞ্চিত বিদ্যুতের সাহায্যে মোটর চালানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে বাস-ট্রামের মত যান-বাহন চালানো সম্ভব নয়। তবে গাড়ির মধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকলে সাধারণ মোটর বাসের মত বৈদ্যুতিক বাস্ চালু করতে অসুবিধা হতো না, কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদক ডায়নামো বা জেনারেটর চাই, জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ পেতে হলে তাকে ঘোরাতে হবে। তার জন্যে চাই গ্যাস বা স্টীম ইঞ্জিন। কাজেই সেটা কেন যে সম্ভব নয় সে কথা সহজেই বুঝতে পার।

কিন্তু সম্প্রতি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জুরিক শহরে বিদ্যুৎ-চালিত এক অদ্ভুত রকমের যাত্রীবাহী বাস্ গাড়ির প্রচলন হয়েছে যাতে অভিনব পন্থায় সহজ উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও মোটর চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে; অথচ ইঞ্জিন বা জেনারেটর চালাবার জন্যে এতে পেট্রোল বা অন্য কোন দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। এই গাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে—ফ্লাই-হুইল।

কি কৌশলে এই ফ্লাই-হুইল বাস চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেকথা মোটা-মুটিভাবে বুঝিয়ে বলছি।

জুরিকে এই বাস চলার রাস্তায় দেড় মাইল থেকে দু-মাইল অন্তর অন্তর বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে খুঁটি স্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেকটি খুঁটির মাথায় এক একটি প্রসারিত বাহু সংলগ্ন আছে; কিন্তু ট্রাম গাড়ির ট্রলি-তারের মত বিদ্যুৎবাহী কোন তার নেই। খুঁটির প্রসারিত বাহুর সঙ্গে সরবরাহ-কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে। গাড়ির পাটাতনের নিচে ৬ ফুট ব্যাসের প্রকাণ্ড একটা ফ্লাই-হুইল আছে। (ফ্লাই-হুইল জিনিসটা আর কিছুই নয়, কুমোরের চাকের মত প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণনক্ষম খুব ভারী একটা প্রকাণ্ড চাকামাত্র)। এই ফ্লাই-হুইলই গাড়ি চালাবার শক্তি উৎপাদন করে। কেমন করে শক্তি উৎপাদন করে, সেকথা বলছি।

গাড়ির ছাতের উপর সঞ্চালনক্ষম তিনটি বাহু আছে। গাড়ি চলবার সময় বাহু তিনটি ছাদের উপর লেপ্‌টে থাকে। গাড়ি সরবরাহ খুঁটির কাছে উপস্থিত হওয়া মাত্রই বাহু তিনটি খাড়া হয়ে ওঠে এবং খুঁটির প্রসারিত বাহুর সংস্পর্শে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপিত হয়। নিচের ছবি ভাল করে দেখে নাও, ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারবে। সংযোগ স্থাপিত হওয়া মাত্রই গাড়ির ভিতরে স্থাপিত বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে ফ্লাই-হুইলটা প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে শুরু করে। ফ্লাই-হুইলটা মিনিটে ৩০০০ বার পাক খেতে পারে।



গাড়ি চলবার মুখে এই বৈদ্যুতিক সংযোগ সাধিত হয়; কাজেই পরক্ষণেই আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; কিন্তু ফ্লাই-হুইল ঘুরতে থাকে। ফ্লাই-হুইলকে একবার ঘুরিয়ে দিলে সেটা অনেকক্ষণ অবধি আপনাআপনিই ঘুরতে পারে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে মোটর চালু হয়ে ফ্লাই-হুইলটাকে ঘূর্ণন বেগ দিয়েছিল; সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এবার মোটর বন্ধ হওয়ারই কথা, কিন্তু ফ্লাই-হুইলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার ফলে মোটরটা ঘুরতে থাকে। এবার কিন্তু সেটা জেনারেটর, অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রে পরিণত হয় এবং এভাবে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি বাস চালাবার মোটরকে পরিচালিত করে। ফ্লাই-হুইলের একবার চার্জে গাড়ি একটানা ৪ মাইল থেকে ৬ মাইল পর্যন্ত চলতে পারে। বাসের গতি অনুসারে পনেরো সেকেণ্ড থেকে এক মিনিট পর পর চার্জ করা যেতে পারে।

রচনাকাল, ১৯৫১

১৬ এক্স-রে

এক্স-রে বা রঞ্জেন-রশ্মির কথা তোমরা সবাই শুনেছ। এক্স-রে'র সাহায্যে আজকাল চিকিৎসাশাস্ত্রের যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে, সেকথাও তোমাদের অজানা নয়। উর্জবাগের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক উইলহেল্‌ম কন্‌রাড রঞ্জেন ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে আকস্মিকভাবে এই অদ্ভুত রশ্মি আবিষ্কার করেন। আকস্মিকভাবে বলছি এই কারণে, তিনি যে এই অদ্ভুত রশ্মি আবিষ্কার করবার জন্যেই গবেষণা করছিলেন তা নয়। ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়ভাবেই তিনি এই অভিনব রশ্মির সন্ধান পান।

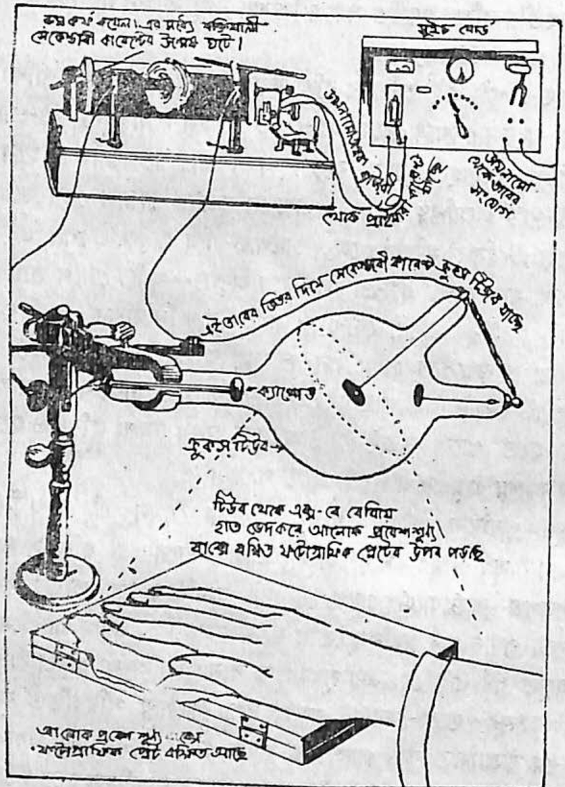
এক সময়ে অনেকেই বায়ুশূন্য কাচ-গোলকের মধ্যে অল্প ব্যবধানে স্থাপিত দুটি তড়িৎ-দ্বারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করবার পরীক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। কাচ-গোলককে বেশির ভাগ বায়ুশূন্য করবার উপায় তখনও উদ্ভাবিত হয় নি। কাচ-গোলক থেকে অধিক পরিমাণে বায়ু-নিষ্কাশন সম্ভব হলে তার মধ্য দিয়ে আরও সহজে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হয় এবং গোলকটি স্নিগ্ধ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনকার দিনে কোন আবদ্ধ পাত্রকে অনেকাংশে বায়ুশূন্য করবার কোন উপায় জানা ছিল না। তারপর জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী জুলিয়াস প্লুকার কাচ-গোলক থেকে এত বেশি পরিমাণে বায়ু-নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন, যা এর আগে আর কেউ করতে পারেন নি। এ রকমের বায়ুশূন্য একটা কাচ-গোলকের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পরিচালনার ফলে তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তড়িৎপ্রবাহ কাচ-গোলকের অ্যানোড (পজিটিভ) প্রান্ত দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ক্যাথোড (নিগেটিভ) প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ক্যাথোড থেকে উদ্ভূত এক রকম অদ্ভুত রশ্মির প্রভাবে গোলকের কাচের দেয়ালটি সবুজাভ স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এটা হলো ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে কথা। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন—কাচ-গোলকের বাইরে থেকেই চুম্বকের সাহায্যে এই ক্যাথোড-রশ্মির গতিপথ পরিবর্তন করা যেতে পারে। তখন কিন্তু অন্য কেউ দূরের কথা, তিনি নিজেই এ আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। প্রকৃত প্রস্তাবে এর প্রায় ৩৬ বছর পরে এই রশ্মির বিস্ময়কর ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। যা হোক, প্লুকারের পর ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে হিটর্ফ এবং ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ ক্যাথোড-রশ্মি সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। ক্রুক্‌স্‌ই কাচ-গোলককে সবচেয়ে বেশি বায়ুশূন্য করে জোরালো ক্যাথোড-রশ্মি উৎপাদনে সক্ষম

হন। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে লেনার্ড আরও বেশি জোরালো ক্যাথোড-রশ্মি সৃষ্টি করেন। ক্যাথোড-রশ্মির গবেষণায় লেনার্ড যতখানি অগ্রসর হয়েছিলেন সে সম্পর্কে কাজ করে পরের বছরেই অধ্যাপক রঞ্জেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। বৈজ্ঞানিক ভাষায় কোন অজ্ঞাত পরিমাণকে বলা হয়—'X'। ক্যাথোড-রশ্মি থেকে উদ্ভূত এই বিস্ময়কর দ্বিতীয় রশ্মির প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরেই রঞ্জেন এর নাম দিয়েছিলেন—X-ray।

ক্যাথোড-রশ্মিই এই অভিনব রশ্মি উৎপন্ন করে। ক্যাথোড-রশ্মি কোন কিছুর উপর গিয়ে পড়লে সেখান থেকে এক্স-রে উদ্ভূত হয়। বায়ুশূন্য কাচ-গোলকের মধ্যে ক্যাথোড-রশ্মি প্রতিহত হয়ে কাচটা যখন আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন তাতে এক্স-রে'রও অস্তিত্ব থাকে। এক্স-রে কাচের দেয়াল ভেদ করে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, ক্যাথোড-রশ্মি কর্তৃক উৎপন্ন এই দীপ্তি খালি চোখেই দেখা যায়, অথচ এক্স-রে একেবারে অদৃশ্য—খালি চোখে তার কিছুই দেখা যায় না। মোটের উপর, বেশি পরিমাণে বায়ু-নিষ্কাশিত কোন কাচ-গোলকের ভিতর দিয়ে তড়িৎস্রোত পরিচালন করলেই ক্যাথোড-রশ্মি দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে সবুজাভ একটা স্নিগ্ধ আলোর আভা দেখা যায় এবং যতই আরও বেশী বায়ু নিষ্কাশিত হতে থাকে ততই সেই আলোর আভা ক্রমশঃ হরিদ্রাভ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য এক্স-রে'ও নির্গত হতে থাকে।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে শেষের দিকে অধ্যাপক রঞ্জেন এই রশ্মি নিয়েই পরীক্ষা করছিলেন। সূর্য-রশ্মির মধ্যে অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সম্পর্কে পরীক্ষার জন্যে একখণ্ড কার্ডবোর্ডের গায়ে বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইডের প্রলেপ মাখিয়ে তিনি একটা পর্দার মত জিনিস তৈরি করেছিলেন। বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইডের একটা অদ্ভুত ধর্ম এই যে, এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানাগুলি অদৃশ্য রশ্মির অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে, অর্থাৎ দৃশ্য আলোয় পরিবর্তিত করতে পারে। ক্যাথোড-রে উদ্ভাসিত কাচ-গোলকের কাছে সেই কার্ডবোর্ডের পদার্থটাকে নিয়ে যেতেই তিনি দেখলেন—পর্দাটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন, ক্যাথোড-রে'র জন্যেই হয়তো পর্দাটা এরূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্যাথোড-রশ্মির আভা বন্ধ করবার জন্যে কাচ-গোলকটাকে কালো কাগজে মুড়ে দিলেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন—কালো কাগজ ঢাকা দেওয়ার ফলে ক্যাথোড-রশ্মির সেই দীপ্তি অদৃশ্য হলো বটে, কিন্তু বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানইডের পর্দাখানি অন্ধকারের মধ্যে আগের মতই জ্বলতে লাগলো। তখন তিনি কালো কাগজ-মোড়া কাচ-গোলক ও উজ্জ্বল পর্দার মধ্যস্থলে নানারকম জিনিস রেখে যা দেখতে পেলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দেখলেন, কোন কোন জিনিস মাঝখানে ধরলে পর্দার উপর বেশ ছায়া পড়ে, আবার কতকগুলি জিনিসের ছায়া প্রায় পড়েই না—এই অভিনব রশ্মি সে সব পদার্থ ভেদ করে চলে যায়।

কাচ-গোলক ও পর্দার মধ্যস্থলে তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিতেই দেখা গেল, চামড়া ও মাংসের ভিতর দিয়ে কেবল আঙুলের হাড়গুলিই দেখা যাচ্ছে। এভাবেই উরজ্‌বার্গ ইউনিভার্সিটির গবেষণাগারের অন্ধকার কক্ষের মধ্যে আকস্মিকভাবেই পদার্থ-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছিল !



এক্স-রে

আজকাল বিভিন্ন ক্লিনিক বা হাসপাতালসমূহে বৃহদাকৃতির এক্স-রে যন্ত্রাদি দেখে তোমাদের স্বভাবতঃই মনে হতে পারে—এক্স-রে উৎপাদনের ব্যবস্থাটা না জানি কতই গুরুতর জটিলতাপূর্ণ। অবশ্য আধুনিক উন্নত ধরনের এক্স-রে যন্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন রকমের নিখুঁত ছবি তোলবার জন্য অনেক জটিল যান্ত্রিক কৌশল রয়েছে। তথাপি এক্স-রে উৎপাদনের মূল যান্ত্রিক ব্যবস্থাটা মোটেই জটিল নয়। ল্যাবরেটরীর সাহায্য পেলে তোমরা অনায়াসেই এক্স-রে উৎপাদন করে দেখতে পার। এক্স-রে উৎপাদন করতে হলে একটা ক্রুক্‌স্‌-টিউবের দরকার। অতিমাত্রায় বায়ুশূন্য বিশেষ রকমের একপ্রকার কাচ-গোলককে বলা হয় ক্রুক্‌স্‌-

টিউব। এই কাচ-গোলকের মধ্যে অনেকটা ব্যবধানে দুদিকে দুটি তড়িৎ-দ্বার বসানো থাকে। এদের একটিকে বলা হয়—অ্যানোড অপরটিকে বলা হয় ক্যাথোড। অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎ-দ্বার দুটিকে রুমকর্ফ কয়েলের সেকেণ্ডারী তারকুণ্ডলীর উভয় প্রান্তের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ব্যাটারী অথবা ডায়নামো থেকে রুমকর্ফ কয়েলের প্রাইমারীতে প্রয়োজনানুযায়ী তড়িৎস্রোত প্রবাহিত করালেই তড়িৎস্রোত ক্যাথোডের অ্যালুমিনিয়াম চাক্তির উপর পড়ে ক্যাথোড-রশ্মির সৃষ্টি করবে। সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রেও উৎপন্ন হবে। ধর, তখন যদি তোমার হাতের ভিতরকার হাড়-গুলিকে দেখতে চাও, তাহলে বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইডের পর্দা ও ক্রুক্‌স্-টিউবের মাঝখানটায় হাতখানা বাড়িয়ে দাও। দেখবে পর্দার উপর তোমার হাতের ভিতরকার হাড়গুলির ছায়া পড়েছে। আর যদি এক্স-রে ফটো তুলতে চাও তবে একখানা ফটো প্লেট আলোক-প্রবেশশূন্য বাক্সে আবদ্ধ করে তার উপর হাতখানা রেখে ক্রুক্‌স্-টিউবের কাছে ধর। এরপর প্লেটখানা ডেভেলপ করলেই দেখবে—তোমার হাতের ভিতরকার হাড়ের ছবি উঠে গেছে। উপরের ছবি ভাল করে দেখে নাও, ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

রচনাকাল, ১৯৫৩

১৭ বাল্‌ব্‌-শূন্য বৈদ্যুতিক আলো

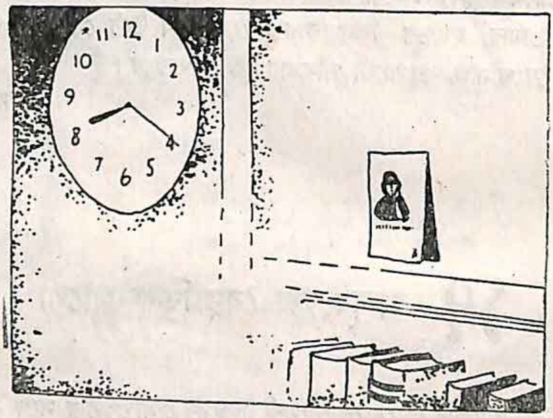
বৈদ্যুতিক আলোর ক্ষেত্রে ফ্লোরেসেণ্ট টিউবের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ অভিনব এক রকমের বাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সাধারণ বিজলী বাতি ও ফ্লোরে-সেণ্ট টিউবের মত এতে কোন বাল্‌ব্‌ বা টিউব নেই, সার্সীর মত কাচ থেকেই আলো বেরুবে। কিছুদিনের মধ্যেই বৈদ্যুতিক ঘড়ির আকারে এই নতুন আলো বাজারে দেখা দেবে বলে আশা করা যায়। ঘড়ির কাজও চলবে, সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির ডায়েল থেকে আলো বেরিয়ে ঘর উদ্ভাসিত করবে। তারপরে পাওয়া যাবে, আলো বিকিরণকারী চৌকা সার্সী, যাদের স্নিগ্ধ আলোকে ঘরের দেয়াল, ছাদ প্রভৃতি আলোকিত হয়ে উঠবে।

বৈদ্যুতিক আলো উৎপাদনের এই নতুন ব্যবস্থাকে বলা হয়—ইলেক্ট্রোল্যুমি-নেসেন্স। কথাটা শুনে তোমাদের মনে হতে পারে—জিনিসটা হয়তো ফ্লোরেসেণ্ট টিউবের রকমফের মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়।

মোটের উপর এই নতুন আলোককে ঠাণ্ডা আলো বলা যেতে পারে। সাধারণ

বিজলী বাতির তুলনায় এর তাপের মাত্রা খুবই কম। কয়েক বছরের অক্লান্ত গবেষণার ফলে সিলভ্যানিয়া ইলেকট্রিক প্রোডাক্টস্-এর রসায়নবিদ ডাঃ পেইন এই অদ্ভুত আলো উদ্ভাবন করেছেন।

অভ্রের পাতের উপর ক্যাস্টর অয়েল সহযোগে প্রধানতঃ জিংক অক্সাইড ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়ার প্রলেপ মাখিয়ে লবণ জলের ভিতর দিয়ে তাতে তড়িৎ প্রবাহিত করলে একরকম দীপ্তি দেখা যায়। অনেকদিন আগে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী এ-ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু অল্প চাপ, অর্থাৎ লো-ভোল্টেজের তড়িৎ প্রবাহিত করলে এই দীপ্তি এতই ক্ষীণ হয় যে, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। এই কারণেই এই বিদ্যুৎ-প্রভা সম্বন্ধে কেউ বিশেষ মনোযোগ দেন নি। কিন্তু ডাঃ পেইন এই ব্যাপারটাকে ভিত্তি করেই অনেক দিনের চেষ্টায় এই নতুন আলো উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছেন।



বাল্‌ব-শূন্য বৈদ্যুতিক আলো

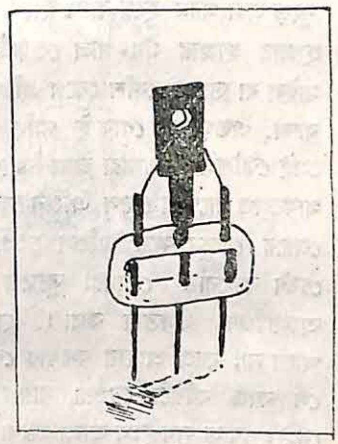
তড়িৎ অপরিচালক কাঁইয়ের সঙ্গে আলো-বিকিরণকারী চূর্ণ মিশিয়ে নতুন ধরনের একরকম তড়িৎ পরিচালক কাচের গায়ে মাখানো হয়। তারপর এই আস্তরণের উপর কাগজের মত পাতলা একখানি ধাতুর পাত বসিয়ে ঘরের ইলেকট্রিক প্লাগের একটি তার কাচের সঙ্গে এবং অপরটি পাতের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। এভাবে জোড়বার ফলে জিনিসটা একটা কণ্ডেন্সারের মত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ডি-সি (কারেণ্ট) ব্যবহার করলে এতে কোন আলো পাওয়া যাবে না। এ. সি (কারেণ্ট) সংযোগ করলেই স্নিগ্ধ আলোতে ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এই ব্যবস্থায় একই সঙ্গে বৈদ্যুতিক ঘড়িও চলবে এবং আলোও পাওয়া যাবে।

রচনাকাল, ১৯৫১

১৮ ট্র্যান্‌জিস্টর

ট্র্যান্‌জিস্টর নামে ইলেকট্রনিক্‌স্‌-এর অপূর্ব যান্ত্রিক কৌশলটি মাত্র অল্প কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত হলেও বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রশিল্পীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই তা দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তো বটেই, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনিক্‌স্‌ সম্পর্কিত ব্যাপারে ট্র্যান্‌জিস্টরের আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ট্র্যানজিস্টরের কথাই অতি সংক্ষেপে তোমাদিগকে বলছি।

ভুট্টার দানার মত ছোট্ট একটি প্লাস্টিকের আধারে জার্মেনিয়াম ধাতুর অতি ক্ষুদ্র একটি টুক্‌রা দৃঢ়ভাবে বসানো থাকে। এই পদার্থটি অতি অদ্ভুত বৈদ্যুতিক গুণসম্পন্ন। ভাল্‌ভ অর্থাৎ ইলেকট্রন টিউব যেভাবে বায়ুশূন্য স্থানে ইলেকট্রন-স্রোত নিয়ন্ত্রণ করে, এটি অনেকটা সেইভাবেই কঠিন পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কিন্তু ভাল্‌ভ আর ট্র্যান্‌জিস্টারের কাজ এক রকমের হলেও ভাল্‌বের পরিবর্তে সেখানে একটা ট্র্যানজিস্টর বসিয়ে নিলেই কাজ চলবে না। কারণ ট্র্যানজিস্টরের জন্য বিভিন্ন রকমের 'সার্কিট' ও বিদ্যুৎসংক্রান্ত অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন।



ট্রান্‌জিস্টর

ইলেকট্রন টিউবের মত ট্র্যান্‌জিস্টরও সঙ্কেত আহরণ, পরিবর্ধন এবং স্পন্দন-উৎপাদনে সক্ষম; অথচ এতে ভাল্‌বের মত ফিলামেণ্ট উত্তপ্তকরণ প্রভৃতি ঝঞ্ঝাটের প্রয়োজন নেই। জার্মেনিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ—কয়লা এবং কোন কোন খনিজ আকরের মধ্যে পাওয়া যায়। মূল্যের দিক দিয়া এটি সোনা এবং প্ল্যাটিনামের মধ্যবর্তী। কিন্তু ট্র্যান্‌জিস্টরের জন্য যতটুকু জার্মেনিয়াম প্রয়োজন হয় তার মূল্য দুই-তিন আনার বেশি নয়। বর্তমানে অ্যাম্‌প্লিফায়ার, ফনোগ্রাফ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার, রেডিও গ্রাহক এবং ছোট্ট প্রেরক যন্ত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে ট্র্যান্‌জিস্টরের কার্যকারিতার বিষয় পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ছবি দেখলেই ট্র্যান্‌জিস্টরের ভিতরের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবে। প্রকৃত জিনিসটার প্রায় আড়াই গুণ বড় করে ছবিতে দেখান হয়েছে।

রচনাকাল, ১৯৫৩

১৭ স্টীম এঞ্জিন

স্টীম এঞ্জিন (বাংলায় যাকে বাষ্পীয়-যন্ত্র বলা হয়) তোমাদের কাছে অপরিচিত নয়। বিভিন্ন রকমের কল-কারখানার এঞ্জিন না হোক, অন্ততঃ রেলগাড়ির এঞ্জিন বোধহয় প্রত্যেকেই দেখেছ। এঞ্জিনে দেওয়া হয়, শুধু জল আর কয়লা। কয়লা পুড়ে জল গরম হয়ে বাষ্প হয়। সেই বাষ্পের জোরেই হাজার হাজার যাত্রী এবং হাজার হাজার মণ মাল বোঝাই রেলের গাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বা তারও বেশি বেগে এঞ্জিন ছুটে চলে। কিন্তু সাধারণ এই গরম জলের বাষ্প, এতগুলো বোঝাই গাড়ি সমেত এঞ্জিনটাকে কেমন করে ঠেলে নিয়ে যায়, সেই কৌশলটা তোমরা জান কি? এঞ্জিনের যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি অনেক জটিলতা থাকলেও বাষ্পের চাপে এঞ্জিন চলবার মোটামুটি কৌশলটা খুবই সহজ। বাষ্পের জোরে কেমন করে এঞ্জিন চলে, সে কথাই আজ তোমাদিগকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবো। তোমরা ভূতের গল্প শুনেছ নিশ্চয়ই। গল্পে আছে, ভূতের অলৌকিক ক্ষমতার কথা। হাজার হাজার মানুষ একযোগেও যে কাজ করতে পারে না, কাজ আদায় করবার কৌশল জানা থাকলে, ভূতকে দিয়ে অনায়াসেই সে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। মানুষ মরে ভূত হয়, কাজেই ভূতের আর মরণ নেই। কিন্তু সুখ-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা বোধ আছে। মরণ নেই বলেই যত খুশি যাতনা দিয়ে যত খুশি কাজ আদায় করা যায়। মনে কর, জলও সেরকমের একটা ভূত। অন্ততঃ পঞ্চভূতের এক ভূত তো বটে। কাজ আদায় করবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিমান মানুষ এই জল-ভূতকে ভর্তি করলো লোহার একটা চোঙের মধ্যে। চোঙটার সব মুখ বন্ধ করে তাঁকে দিল আগুনে ফেলে। অসহ্য উত্তাপে চোঙের মধ্যে সে বাষ্প হয়ে পাত্রটাকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে যেতে চায়। মানুষ তখন চোঙের গায়ে সরু একটা দরজা খুলে দিল। বিশেষ একটা মতলব করেই সেই দরজার সঙ্গে সে বড় একটা লোহার পিচকিরি জুড়ে রেখেছে। মন্তব্য হলো, বাষ্পরূপী জল-ভূত যদি পিচকিরির ভিতরের ভারী চাকতিখানাকে ঠেলে খানিকটা উপরে নিয়ে যেতে পারে তবে বেরিয়ে যাবার জন্যে সরু একটা রাস্তা খোলা পাবে। অসহ্য উত্তাপে অধীর হয়ে বাষ্পরূপী জল-ভূত খোলা দরজা দিয়ে পিচকিরির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং ভিতরের চাকতিখানাকে উপরে ঠেলে নিয়ে যায়। চাকতিখানা কিছু উপরে উঠলেই পিচকিরির গায়ে একটা ছিদ্র-পথ বেরিয়ে পড়ে। সেই ছিদ্র দিয়ে বাষ্প-রূপী ভূত বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তখন মানুষ দেখলো—

পিচকিরির চাকতিখানাকে একবার উপরে তুললেই তো আর কোন কাজ হবে না। বাষ্পরূপী ভূতকে দিয়েই আবার তাকে নিচের দিকে ঠেলে নিতে হবে। তবেই কাজ পাওয়া সম্ভব। তখন মানুষ কৌশল করে পিচকিরির উপরের দিকটা এঁটে দিল এবং যে দরজা দিয়ে পিচকিরির মধ্যে বাষ্প ঢোকবার কথা সেখানে দুটো দরজা বসিয়ে দিল। একটা দরজা দিয়ে পিচকিরির নিচের দিকে, আর একটা দরজা দিয়ে পিচকিরির উপরের দিকে ঢুকতে পারে। এই দুটো দরজার জন্যে আছে বিশেষ কায়দায় তৈরী একখানা মাত্র কবাট। পিচকিরির ভিতরের চাকতি সংলগ্ন ডাঁটটার সঙ্গে এমন কৌশলেই ওই কবাটখানার সংযোগ করা হয়েছে যে, বাষ্পরূপী ভূতের চাপে পিচকিরির ভিতরের চাকতিটা উপরে ওঠামাত্রই নিচের



স্টীম এঞ্জিনের পরিকল্পনা

দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং উপরের দিকের দরজা খুলে যায়। কাজেই তখন সে উপরের দরজা দিয়ে ঢুকে পিচকিরির চাকতিটাকে আবার নিচের দিকে ঠেলে আনে। চাকতিটাকে নিচে অথবা উপরে ঠেলে আনবার পর সে বেরিয়ে যাবার রাস্তা পায়। এভাবে লোহার পিচকিরির ডাঁটটা অনবরতই উপরে, নিচে ওঠানামা করতে থাকে। আচ্ছা, পিচকিরির ডাঁটটা না হয় ওঠানামা করলো, তাতে চাকা ঘুরবে কেমন করে? খুব সহজ কৌশলেই সে ব্যবস্থা করে নিয়ে মানুষ জল-ভূতের শক্তিতে বড় বড় জাহাজ, রেলের গাড়ী এবং আরও অনেক রকমের কল-কারখানা চালাচ্ছে। দর্জির দোকানে সেলাইয়ের কল দেখেছ তো? কলটার নিচের দিকে তাকালেই দেখবে—পা-দানের সঙ্গে খাড়াভাবে একটা লোহার 'রড' দিয়ে উপরের চাকার সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। ঠিক তালমত পায়ের চাপে 'রড্‌টা' ওঠানামা করলেই চাকাটা ঘুরতে থাকে। বাষ্পের চাপে পিচকিরির ডাঁটটা ওঠানামা করে ঠিক ওই রকম ব্যবস্থাতেই কলকারখানা বা এঞ্জিনের চাকা ঘুরিয়ে থাকে।

যে বুদ্ধিমান মানুষটি জল-ভূতকে এরূপভাবে বন্দী করে তাকে দিয়ে প্রথম রেলের এঞ্জিন চালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর নাম ছিল—জেম্‌স্ ওয়াট। শোনা যায় গরম জলের কেট্‌লি থেকে বাষ্প বেরিয়ে যাবার সময় ঢাকনাটার ওঠানামা

দেখেই জেম্‌স্ ওয়াট স্টীম এঞ্জিন তৈরি করবার কথা মনে করেন। কিন্তু এর বহুকাল পূর্বেই মানুষ বাষ্পের শক্তির বিষয় জানতে পেরেছিল। প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে আলেকজেণ্ড্রিয়ার হিরো বাষ্পচালিত ঘূর্ণনশীল একরকম খেলনা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। যন্ত্রটায় জটিলতা কিছু নেই। দুদিকে দুটা খুঁটির গায়ে পিনের উপর ধাতু নির্মিত একটা ফাঁকা বল বসানো। বলটার গায়ে দুদিকে মাথা বাঁকানো দুটো সরু নল আছে। একটা নলের মুখ কর্ক দিয়ে বন্ধ করে, বলটাকে বেশ করে আগুনে তাতিয়ে, অপর নলের মুখটা জলে ডুবিয়ে ধরলেই বলের মধ্যে জল ঢুকে যায়। তখন কর্কটা খুলে নিয়ে বলের তলায় আগুনের তাপ দিতে থাকলে ভিতরের জল বাষ্প হয়ে দুটো নল দিয়েই জোরে বেরিয়ে আসতে থাকে। এই বাষ্পের ধাক্কায় বলটা পিনের উপর দ্রুতগতিতে ঘুরতে শুরু করে।

এরপর বহুকাল পর্যন্ত বাষ্প দিয়ে কোন যন্ত্রপাতি চালানোর খবর শোনা যায়নি। আজ থেকে প্রায় দু'শো আটান্ন বছর আগে ডেনিস্ পেপিন নামে ফরাসী দেশের একজন পদার্থ-বিজ্ঞানীই বোধহয় সর্বপ্রথম বাষ্প-চালিত একরকম কল উদ্ভাবন করে কিছু কাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। তারপর খনি থেকে জল ও কয়লা তোলবার জন্যে ১৭০৫ খৃস্টাব্দে নিউকোমেন ও কলি আরও উন্নত ধরনের বাষ্পীয় যন্ত্র তৈরি করতে সমর্থ হন। তার পরেই আসরে অবতীর্ণ হন জেম্‌স্ ওয়াট। প্রথমে তিনি নিউকোমেন উদ্ভাবিত যন্ত্রেরই উন্নতি সাধনে মন দেন। অনেক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গবেষণার ফলে তিনি কাজের উপযোগী রেলের এঞ্জিন তৈরি করতে সমর্থ হন। এক হিসাবে ওয়াটকেই বর্তমান এঞ্জিনের জন্মদাতা বলা যেতে পারে। মোটের উপর এখন আমরা যেসব শক্তিশালী স্টীম এঞ্জিন দেখতে পাই তা একদিনেই, একজনের চেষ্টার ফলে উৎপন্ন হয়নি। এর পিছনে বহুকাল ধরে বহু বিজ্ঞানীর বুদ্ধি ও পরিশ্রম খরচ করতে হয়েছে। এদের মধ্যে জেম্‌স্ ওয়াট, উইলিয়াম মারডক, জর্জ স্টীফেনসন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮১৩ খৃস্টাব্দে উইলিয়াম হেড্‌লি, কয়লার খনির কাজের জন্যে 'পাফিং বিলি' নামে এক ধরনের রেলের এঞ্জিন তৈরি করেন। প্রথম যাত্রীবাহী গাড়ী চালানো হয় ইংল্যাণ্ডের স্টকটন্ এবং ডার্লিংটন লাইনে, ১৮২৫ খৃস্টাব্দে। ১৮৩০ খৃস্টাব্দেলিভারপুল এবং মান্‌চেস্টার লাইন খোলা হয়। স্টফেন্‌সন নির্মিত 'রকেট' নামক এঞ্জিন এ লাইনে ব্যবহৃত হতো।

সবরকম এঞ্জিনের চলার কৌশলই মূলতঃ এক। ছবি থেকে এঞ্জিন চলবার মূল কৌশলটা মোটামুটি বুঝতে পারবে। একটা বড় লোহার পিচকারি। পিচকারির চাক্‌তি। ওই চাক্‌তি সংযুক্ত পিচকারির ডাঁট। পিচকারির মধ্যে বাষ্প ঢোকবার পথ খোলা ও বন্ধ করবার কবাটের ডাঁট। সেলাইয়ের কলের চাকাটা, মধ্যস্থলে একটুখানি বাঁকানো একটা দণ্ডের উপর যে ভাবে বসানো

থাকে ঠিক সেরূপ একটা দণ্ডের সঙ্গে ডাঁটা দুটা সংলগ্ন। কিন্তু সে অংশটা এখানে দেখানো হয়নি। চৌকা বাক্সের মত একটা কুঠুরী; পিচকিরির গায়ে সংলগ্ন। নিচের দিকের কালো মোটা নলটা দিয়ে 'বয়লার' (যেখানে জল গরম করে বাষ্প তৈরি করা হয়) থেকে বাষ্প এসে বাক্সটার মধ্যে ঢোকে ; কিন্তু নলটার মধ্যখানে একটা ভাল্‌ভ্ বা কৌশলী দরজা এমনভাবে বসানো যে, একবার ঢুকলে আর সেদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। ওই বাক্স থেকে পিচকিরিটার গায়ে, উপর ও নিচের দিকে যে দুটো কালো লাইন দেখা যাচ্ছে সে দু'টোই হলো পিচকিরির মধ্যে বাষ্প ঢোকাবার দুদিকের দুটা রাস্তা।

বাক্সটার মধ্যে একটি ডাঁটার প্রান্তভাগে সংলগ্ন একটা বাঁধানো জিনিস রয়েছে। ওটাই হলো পিচকিরির মধ্যে বাষ্প ঢোকাবার রাস্তার কবাট। ছিদ্রটা হলো বাষ্প বেরিয়ে যাবার রাস্তা। এবার একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা কর, কেমন করে বাষ্পের চাপে এঞ্জিন চলে। বাক্সটার মধ্যে কবাট এবং দরজাগুলোর ব্যবস্থা যদি বুঝতে পার তবেই দেখবে কত সহজ, সাধারণ একটা কৌশলে স্টীম এঞ্জিন চলে থাকে। ছবিতে যে রকম আছে তাতে বাক্স থেকে বাষ্প নিচের দিকের খোলা দরজা দিয়ে পিচকিরিতে ঢুকে চাকতিখানাকে উপরের দিকে ঠেলে নিয়ে যচ্ছে। দরজা ও কবাটখানার ব্যবস্থা এমনই যে, ঠিক ওই সময়ে পিচকিরির ওপরের দিকের বাষ্প বেরিয়ে যাবার জন্যে একটি রাস্তা আর একটি রাস্তার সঙ্গে মিলে গেছে। দ্বিতীয় চাকতিটা পুরোপুরি উপরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে কবাটের অবস্থান বদলে যাবে। এবার একটি কবাট নিচের রাস্তাটাকে বাইরে যাবার রাস্তার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিচকিরিটার উপরের দিক দিয়ে বাষ্প ঢোকাবার জন্যে আর রাস্তাও খুলে দিয়েছে। কৌশলটা এমনই যে, একদিকের ঢোকবার রাস্তা খুললেই অপর দিকের ঢোকবার রাস্তা বন্ধ হবে এবং যে দিকের ঢোকবার রাস্তা বন্ধ হবে তার বাইরের রাস্তা খুলে যাবে। আজকালকার রেলের এঞ্জিনের ভিতরে কি কি ব্যবস্থা থাকে এবার সেকথা বুঝিয়ে বলছি। এ থেকেই তোমরা এঞ্জিন চলার মোটামুটি রহস্যটা বুঝতে পারবে। এঞ্জিনে পিছনের দিকে ড্রাইভারের ছোট্ট ঘর, তার পরেই হলো প্রকাণ্ড জলন্ত চুল্লী। বিরাট একটা লম্বা চোঙের মত বয়লার। এর মধ্যে জল গরম হয়ে প্রচণ্ড চাপের বাষ্প উৎপন্ন হয়। চুল্লী থেকে কতকগুলো লম্বা ধাতব নল রয়েছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে আগুনের হল্‌কা, গরম বাতাস পরিচালিত হয়ে জল গরম করবার সুবিধা হয় এবং রাস্তায় সামনের ফানেল দিয়ে ধোঁয়াও বেরিয়ে যায়। বয়লারের উৎপন্ন বাষ্প এঞ্জিনের ঘাড়ের উপর কুজের মত এক স্থানে জমায়েৎ হয়ে জলকণা যুক্ত হয়। বাষ্প সেখান থেকে একটি নল দিয়ে লৌহ-পিচকিরির উপরের বাক্সটার

মধ্যে প্রবেশ করে এবং কবাটখানার অবস্থান অনুযায়ী যে রাস্তা খোলা পায় সেখান দিয়েই পিচকিরির মধ্যে ঢুকে চাকৃতিখানাকে সামনে অথবা পিছনে ঠেলে নিয়ে যায়। এর ফলেই রডের সাহায্যে চাকাটা ঘুরে যায়। বাষ্পের চাপে চাকৃতিখানা অবিরত এদিক-ওদিক করার ফলে এঞ্জিনের চাকাটাও একটানা ঘুরতে থাকে।

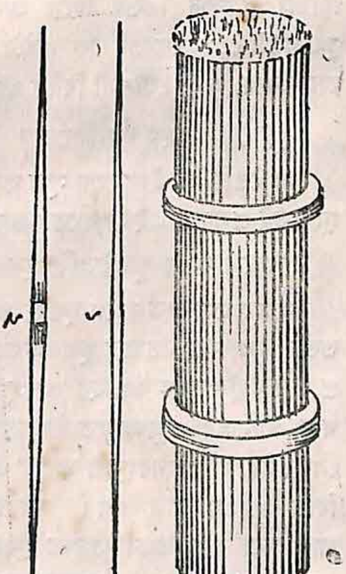
১০ সূচ ও আলপিন

সূচ আলপিন, পেন্সিল, কাগজ, কলম প্রভৃতি জিনিসগুলো আমাদের নিত্যই প্রয়োজন। দামে সস্তা এবং সহজলভ্য হওয়ায় আমরা এগুলোকে তুচ্ছ জিনিস বলেই মনে করি। একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে—যত তুচ্ছ মনে হয় আসলে কিন্তু ওগুলো তত তুচ্ছ নয়। এই তুচ্ছ জিনিসগুলো তৈরি করতে কি বিরাট ব্যাপার—কি বিরাট কলকারখানার প্রয়োজন হয়, সে কথা শুনলে তোমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। সূচ একটা অতিক্ষুদ্র, তুচ্ছ পদার্থ ছোট্ট এক টুকরা ইস্পাতের তার মাত্র। সূচের মুখটা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে এসেছে আবার পিছনের দিকে ছোট্ট একটা চোখ। এই সূক্ষ্ম বস্তুটা কেমন করে তৈরি হয়? হাতে ঘষে অনেক পরিশ্রমের ফলে এক আধটা সূচ তৈরি করা সম্ভব বটে ; কিন্তু যে সূচ আজকাল আমরা ব্যবহার করি তার সবগুলোই নির্দিষ্ট মাপের, একই রকমের—যেমন মসৃণ চকচকে তেমনই নিখুঁত। তাকে এত কম দামে কেমন করে পাওয়া যায়—এ প্রশ্ন কি কখনও তোমাদের মনে জাগেনি? কেমন করে সূচ তৈরি হয়, কেমন করে কাগজ, কলম, কাচের দোয়াত, বাসন কোসন ও অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি হয় —এসব কথা নিশ্চয়ই তোমাদের জানবার ইচ্ছা হয়। এসব বিষয় সম্পর্কে ক্রমশঃ তোমাদের কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করবো। এখন মোটামুটি ব্যাপারটা জেনে

রাখলে, বড় হয়ে এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিস্তৃত বিবরণ নিজেরাই চেষ্টা করে জেনে নিতে পারবে। আজ তোমাদিগকে সূচ এবং আলপিন তৈরির কথা বলছি।

সূচ অনেক রকমের হয়ে থাকে—একথা বোধ হয় তোমাদের অজানা নয়। সাধারণত দু'রকমের সূচের সঙ্গে তোমরা নিশ্চয়ই পরিচিত। সেলাইয়ের কল সূচ আর সাধারণ সেলাই-ফোড়াই করবার সূচ। তাছাড়া গেঞ্জি-কলের সূচও বোধহয় অনেকেই দেখেছ। সাধারণ সূচের পিছন দিকে যে ছিদ্র থাকে তাকে বলা হয় সূচের চোখ। ছোট্ট সূচের চোখে সূতা পরানো যে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন সে কথা তোমরা জান। এই চোখটাই হলো সূচের আসল জিনিস। সাধারণ সূচের চোখটা থাকে পিছনের দিকে, আর সেলাইয়ের কলের সূচের চোখটা থাকে ডগায়। মোজা, গেঞ্জি বোনবার সূচগুলো কিন্তু আরও অদ্ভুত। এদের মুখটা ভোঁতা আর চোখটা থাকে সাধারণ সূচের মতই পিছনে। কিন্তু চোখটা এমন অদ্ভুত কায়দায় তৈরি যে, সূতা পরাবার কোন হাঙ্গামাই নেই। চোখটার একপাশে ফাঁক—সূতাটা আপনাআপনিই চোখের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকটাও বন্ধ হয়ে যায়।

যা হোক, সূচের পিছনে চোখ থাকাটাই ছিল বরাবর তার ব্যবস্থা। কিন্তু কলে সেলাই করবার জন্যে সূচের পিছনের এই চোখটাকে মাথায় আনতে হয়েছিল। সে এক অদ্ভুত ইতিহাস। সামান্য একটা সূচ, তার তুচ্ছ একটা চোখ। পিছন থেকে মাথার দিকে এই তুচ্ছ চোখটার স্থান পরিবর্তনের ইতিহাস অতীব বিস্ময়কর। সেলাই করতে হলে সূতা-পরানো সাধারণ একটা সূচের কাপড়ের একদিক দিয়ে ফুঁড়ে অপর দিক দিয়ে বের করে নিতে হয়। কলের সাহায্যে এরূপ ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য। কাজেই অনেককাল ধরে বিভিন্ন লোকের চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তোষজনক সেলাইয়ের কলের উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি। আমেরিকার এক ভদ্রলোক



ব্ল্যাংক্স

প্রায় সারাজীবন ধরেই সেলাই-কলের উন্নতি বিধানের জন্যে চেষ্টা করে আসছিলেন। কিন্তু সূচের এই পিছন দিকের ছিদ্রের জন্যে অন্যান্য লোকের মত কিছুতেই তিনি সাফল্য লাভে সমর্থ হচ্ছিলেন না। এভাবে তাঁর প্রায় বিশ বছর কেটে গেল।

একদিন তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। রেড্ইণ্ডিয়ানরা বল্লম নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করছে। তিনি শুয়েই আছেন, উঠতে পারছেন না, হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা বল্লমের ফলা তাঁর প্রায় নাকের ডগার কাছে এসে গেছে—মুহূর্তের মধ্যেই তাঁকে গেঁথে ফেলবে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করলেন—বল্লমের ফলাটায় লম্বাটে গোছের একটা ছেঁদা। বল্লমের ডগায় ছেঁদা কেন? ঘর্মাক্ত কলেবরে জেগে উঠে তিনি বিস্মিত হয়ে কেবল সে কথাই ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হলো—আচ্ছা, সূচের ছেঁদাটাকে যদি পিছন থেকে স্বপ্নে-দেখা বল্লমের ফলার মত মাথায় আনা যায় তবে তো সেলাই-কলের সমস্যাটা সহজেই মিটে যেতে পারে। হলোও তাই। সূচের পিছনের ছেঁদা মাথায় এনে তিনি সেলাইকল তৈরির সমস্যা অনায়াসেই সমাধান করে ফেল্লেন। তখন থেকেই প্রকৃত সেলাই-কলের উদ্ভব হলো।

যাহোক, এখন তোমাদিগকে সূচ তৈরির কথা বলছি। প্রত্যেকটা সূচ কেমন মসৃণ, চকচকে, নিখুঁত—তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। তোমরা শুনে বিস্মিত হবে যে এরূপ সুদৃশ্য আকার ধারণ করতে এই তুচ্ছ বস্তুটাকে অন্ততঃ বিশ রকমের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আসতে হয়। বস্তুটা তুচ্ছ হলে কি হয়। এই তুচ্ছ বস্তুটা তৈরি করতেই এক একটা কারখানায় হাজার হাজার লোক রাতদিন কাজ করছে, অপূর্ব কৌশলী বিচিত্র যন্ত্রপাতি চলছে।

সূচ তৈরি হয় কি দিয়ে?

সূচ তৈরি হয় ইস্পাতের সূক্ষ্ম তার থেকে। বিলাতের সেফিল্ডের কারখানাগুলিতেই প্রধানতঃ এই ইস্পাতের তার উৎপাদিত হয়ে থাকে।

কেমন করে সূচ তৈরি হয়?

অনেক তার এক সংগে কুণ্ডলী করা থাকে। দুটা সূচ লম্বায় যতটা হবে ঠিক ততটা লম্বা করে, তারের কুণ্ডলীটাকে প্রথমত খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়। খণ্ড করা প্রত্যেকটি টুকরোকে বলা হয় 'লেংথ্'। কুণ্ডলী থেকে কাট্ হয় বলে 'লেংথ'গুলো থাকে খানিকটা ধনুকের মত বাঁকানো। কাজেই প্রথমে দরকার—এই তারগুলোকে সোজা করা। অনেকগুলো 'লেংথ' একত্রিত করে দুদিকে দুটা শক্ত আংটির বাঁধন দিয়ে বাণ্ডিল করা হয়। তারের বাণ্ডিলগুলিকে অতঃপর চুল্লীতে পুড়িয়ে লাল করা হয়, তখন তারের টুকরা বা 'লেংথগুলো হয়ে যায় নরম। চুল্লী থেকে বার করবার পর সামান্য ঠাণ্ডা করে 'লেংথ'গুলোকে লোহার মসৃণ টেবিলের উপর রাখা হয়। সেখানে 'স্মুদ ফাইল' নামক বক্রপৃষ্ঠ একপ্রকার লৌহযন্ত্রের সাহায্যে 'লেংথ'গুলো সম্পূর্ণরূপে সোজা না হওয়া পর্যন্ত ডলাই চলতে থাকে। প্রত্যেকটি সোজা তারের টুকরা থেকে দুটি করে সূচ তৈরি হবে। এদের বলা হয় 'ব্ল্যাংক্স্'।

'ব্ল্যাংকৃসে'র মুখগুলো কেমন করে তীক্ষ্ণ করা হয় ?

অদ্ভুত কৌশলসম্পন্ন একপ্রকার শাণ যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ব্ল্যাংকৃসের মুখগুলো সরু ও তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়। শান-চক্রটা ঘোরে রাবারে ঢাকা একটা চাকার মধ্যে! রাবারে ঢাকা চাকা ও শাণের চাকার মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক আছে! 'হপার' নামক এক প্রকার কৌশলী পাত্র থেকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ব্ল্যাংকৃস্-গুলো ওই ফাঁকের মধ্যে আপনা আপনি ঢুকে গিয়ে চাকার গায়ের রবারের সংগে লেগে থাকে। চাকাটা ঘোরবার সময় শাণ-চক্রের ঘর্ষণে 'ব্ল্যাংকসে'র মুখ তীক্ষ্ণ এবং মসৃণ হয়ে যায়। ঘর্ষণের ফলে নির্গত অতিসূক্ষ্ম ইস্পাত-কণিকা ধূলার আকারে একটা নলের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ইস্পাতের এই সূক্ষ্ম চূর্ণগুলোকে বাইরে বের করে দেওয়া নেহাত প্রয়োজন। কারণ এগুলো কারখানার মধ্যে ছড়িয়ে গেলে নাক মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে কর্মীদের গুরুতররূপে স্বাস্থ্য-হানি ঘটিয়ে থাকে। শাণ-যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে হাতে চালানো শাণে একাজ করা হতো। তখন এই মিহি লৌহচূর্ণ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে বহুলোক মারা যেত।

সূচের চোখ কেমন করে তৈরি হয় ?

'ব্ল্যাংকৃসে'র দুদিকের মুখ সুতীক্ষ্ণ হওয়ার পর এমারির চাকার ঘর্ষণে সেগুলোকে পালিস করা হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে এক একটা করে আপনা আপনি স্ট্যাম্পিং-মেসিনে চলে যায়। সেখানে 'ব্ল্যাংকৃসে'র ঠিক মধ্যস্থলের খানিকটা চেপ্টা করে এবং যেখানে সূচের চোখ থাকে সেখানে দাগ কেটে দুদিকে একটু খাঁজের মত করা হয়। পরে এই দাগের উপরেই হ্যাণ্ড-প্রেস বা মেসিন-প্রেসের সাহায্যে ছিদ্র করা হয়। এরপরে 'ব্ল্যাংকৃসে'র দুদিকের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দুগাছা সরু তার প্রবেশ করিয়ে দেয়। 'ফাইলার' নামক কর্মীরা দুগাছা তারে গাঁথা সারিবদ্ধ সূচ-গুলোর ছিদ্রের আশপাশ মসৃণ করে দেবার পর তারের মধ্যে গাঁথা অবস্থাতেই সেগুলোকে সামনে ও পিছনে বাঁকাতে থাকে। ফলে দুটা চোখের মধ্যস্থল ভেঙে গিয়ে দু'সারি সূচের মালা সৃষ্টি হয়। তারে গাঁথা সূচের মালাগুলোকে অতঃপর 'ভাইস' নামক এক প্রকার যন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে দেয়। সেখান থেকে পালিস হয়ে এবং ডগাগুলো নির্দিষ্ট আকৃতি নিয়ে বেরিয়ে আসে।

এভাবে সম্পূর্ণরূপে তৈরী সূচ পাওয়া গেল বটে ; কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকী। তৈরী সূচগুলোকে এবার সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ একটা পাত্রে রেখে চুল্লীতে পুড়িয়ে লাল করা হয়। তেল ভর্তি বৃহৎ পাত্রের মধ্যে হঠাৎ ডুবিয়ে দিয়ে সেগুলোকে ঠাণ্ডা করে। তেল থেকে তুলে নিয়ে আবার ধীরে ধীরে গরম করে পুনরায় ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা হয়। একে বলে 'টেম্পার' করা বা পান দেওয়া। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এরূপ 'টেম্পার' করার ফলে সূচগুলো কড়া হয়ে যায়। কিন্তু বার বার পোড়ানো এবং ঠাণ্ডা করবার ফলে সেগুলো হয়ে যায় কালো এবং

খস্‌খসে। কাজেই আবার পালিস করা দরকার। ক্যানভাসের মধ্যে নরম সাবান, এমারি-পাউডার এবং তেলের সঙ্গে সূচগুলোকে রেখে রোলারের মত করে পাকিয়ে তোলা হয়। লোহার টেবিলের উপর স্থাপিত দুখানা পুরু কাঠের ব্লকের মধ্যে এই ক্যানভাসের রোলারগুলোকে বসিয়ে যন্ত্র-সাহায্যে সামনে পিছনে ডলাই করবার পর সূচগুলো বার করে খুব ভাল করে ধোলাই করা হয়। এরপরে পালিস-পাউডার মিশিয়ে আবার রোলারে ডলাই করবার পর বার্নিশ করে বিক্রয়ের জন্যে প্যাকেটে ভর্তি হতে চলে যায়।

আলপিন তৈরি হয় কেমন করে ?

আলপিন তৈরি হয় পিতলের সরু তার থেকে। তৈরি হবার পর সেগুলোকে টিন বা রাঙের কলাই করে দেওয়া হয়। ভার্ডিগ্রিজ নামে একরকম বিষাক্ত পদার্থ পিতলের উপর জমে বলেই বিশেষ করে কলাই করা দরকার। ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে অবধি বিলাতে হাতে করেই আলপিন তৈরি হতো। মাথাগুলো আলাদা তৈরি হতো। মাথাগুলো আলাদা তৈরি করে জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আজকাল সম্পূর্ণরূপে কলেই আলপিন তৈরি হয়। আমেরিকানরাই সর্বপ্রথম আলপিন তৈরির যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। একটা যন্ত্রের সামনের দিকে প্রকাণ্ড একটা 'রিল' আছে। আলপিন তৈরি করবার তারগুলো এই রিলের গায়ে জড়ানো থাকে। তারটাকে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সোজা হয়ে আসতে হয়। সাঁড়াশির মত একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তারের মুখটাকে টেনে ধরে সেই অবস্থায় 'স্ট্যাম্পিং' করে মাথাটা তৈরি হয় এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় তারটা ঠিক মাপ মত কেটে যায়। এই কর্তিত খণ্ডগুলোর ভোঁতা দিকটা একটা যন্ত্রের সাহায্যে সূঁচালো করা হয়। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারটা থেকে একটার পর একটা করে অতি দ্রুতগতিতে আলপিন তৈরি হতে থাকে। পিনের মুখটা তীক্ষ্ণ করা হয় চক্রকার একপ্রকার উখার সাহায্যে। চক্রের মত এই যন্ত্রটা অতি দ্রুতবেগে ঘুরতে থাকে। যান্ত্রিক কৌশলেই আলপিনগুলো আপনাআপনি সামনে পিছনে যাতায়াত করে' চাকার ঘর্ষণে সূচীমুখ হয়ে যায়। এ অবস্থায় পিনগুলো যখন বেরিয়ে আসে তখন থাকে হল্‌দে রঙের। হল্‌দে পিনগুলোকে ঘূর্ণায়মান পিপের মত একটা যন্ত্রের মধ্যে রেখে পরিষ্কার করা হয়। তারপর সেগুলোকে রাং বা টিন চূর্ণ ও অ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়ে লৌহপাত্রে উত্তপ্ত করা হয়। টিনের কলাই হবার পর পিনগুলোকে যন্ত্র সহযোগে শুকিয়ে নেয়, তারপর পালিশ করে আলাদা এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের মধ্যে গেঁথে বিক্রয়ের জন্যে চালান দেওয়া হয়।

রচনাকাল, ১৯৪৮

২১ প্ল্যানেটেরিয়াম

প্ল্যানেটেরিয়ামের কথা অনেকেই জান, কারণ যন্ত্রটা উদ্ভাবিত হয়েছে অনেককাল আগে। ইউরোপের মধ্যে একমাত্র বৃটেনই এতকাল প্ল্যানেটারিয়ামের মত একটা বিস্ময়কর অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। অথচ সুইডেনের মত ক্ষুদ্র দেশেও প্ল্যানেটেরিয়াম রয়েছে। জার্মানীর তো কথাই নেই। মস্কোর প্ল্যানেটেরিয়ামে বছরে দশলাখেরও বেশী দর্শকের সমাগম হয়ে থাকে। আমেরিকারও অনেক জায়গাতেই প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় বছর দুই হলো বৃটেন একটা প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপনের চেষ্টা চলছে। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে, বৃটেনে প্ল্যানেটেরিয়াম তৈরির ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়। তবে প্রথম প্রচেষ্টার ফলে জার্মান যন্ত্রের চেয়ে তাদেরটা অনেক নিকৃষ্ট হবেই। কাজেই জার্মেনীতে এখনও যেসব প্ল্যানেটেরিয়াম অক্ষত অবস্থায় রয়েছে তা থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটা যন্ত্র আনা যেতে পারে। সায়েন্স মিউজিয়ামে প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। প্ল্যানেটেরিয়ামের পরিবর্তে তাকে বলা হবে—'স্টারহাউস'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত জার্মেনীর ভি-টু মারণাস্ত্রের মত প্ল্যানেটেরিয়ামও যান্ত্রিক কৌশলের এক অপূর্ব বিষয়। উভয়ের উদ্দেশ্য অবশ্য বিভিন্ন ; ভি-টু ধ্বংসকার্যের জন্যে আর প্ল্যানেটেরিয়াম জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্যে পরিকল্পিত হয়েছে। আমাদের সৌরজগতে চন্দ্র, পৃথিবীর চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী আবার চন্দ্রকে নিয়ে সূর্যপ্রদক্ষিণ করছে। কেবল চন্দ্র আর পৃথিবীই নয়,পৃথিবীর মত আরও অনেকগুলো গ্রহ তাদের উপগ্রহ নির্দিষ্ট গতিতে, নিয়মিতভাবে সূর্যের চতুর্দিক পরিভ্রমণ করছে। তা ছাড়া আমাদের পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে অসীম শূন্যের অসংখ্য তারকারাজির ক্রমাগত স্থান-পরিবর্তন লক্ষিত হয়ে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার বিবরণ থেকে আমরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কক্ষপথ ও গতিবিধির জটিলতার ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারি মাত্র ; মানসপটে তাদের একটা বাস্তবচিত্র কল্পনা করা সহজ নয়। কোন ঘটনা উপলব্ধি করতে হলে মনে মনে আমরা তার একটা ছবি কল্পনা করে নিই। সৌরমণ্ডলের গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করতে হলে তাদের একটা নিখুঁত চিত্র কল্পনা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অনেককাল থেকেই বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয়ে আসছিল ; কিন্তু কোনটাই আশানুরূপ হয়ে ওঠেনি। প্ল্যানেটেরিয়োম তারই একটা সর্বোন্নত নিখুঁত সংস্করণ।

উপরের দিকে তাকালেই মনে হবে—আকাশটা যেন একটা বিশাল গম্বুজের মত গোল হয়ে আছে। এই গম্বুজাকৃতি আকাশের মধ্যেই আমরা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রগুলোকে দেখতে পাই। প্ল্যানেটোরিয়ামের জন্যে এরকমের গম্বুজাকৃতি একটা বিরাট ঘরের প্রয়োজন। গম্বুজের মসৃণ অভ্যন্তরভাগ গোলাকার আকাশের ক্ষুদ্র অনুকৃতি মাত্র। প্ল্যানেটোরিয়ামের সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর অনুরূপ ছোট বড় আলোক-প্রতিকৃতি ওই গম্বুজের গায়ে প্রতিফলিত করে তাদের স্বাভাবিক গতিবিধি দেখানো হয়। আপেক্ষিক গতিবিধি ছাড়াও আলাদা ভাবে যে কোন গ্রহ-উপগ্রহের গতিবেগ বাড়িয়ে কমিয়ে দেখানো যেতে পারে।

ওরেরী নামে ছেলেদের একরকম খেলনা আছে। চন্দ্র পৃথিবীর চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী আবার সেই ঘূর্ণায়মান চন্দ্রকে নিয়ে পাক খেতে খেতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে—এই ব্যাপারটার ছোট্ট একটা মডেল, ঘটিকা-যন্ত্রের কৌশলে পরিচালিত হয়। এর নামই ওরেরী। আর্ল অফ ওরেরী এই খেলনা যন্ত্রটা উদ্ভাবন করেন। সেথেকেই যন্ত্রটা ওরেরী নামে পরিচিত হয়েছে। ওরেরীর নাম ছিল চার্লস্ বয়েল। রসায়নশাস্ত্রের জন্মদাতা রবার্ট বয়েলের ছিলেন তিনি নিকট জ্ঞাতি। তখনকার দিনে (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত) বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করাটাকেই বড় লোকের লক্ষণ বলে মনে করা হতো। চার্লস বয়েল তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত লোক। একাধারে তিনি ছিলেন সৈনিক, গ্রন্থকার এবং কূটনীতিজ্ঞ। অথচ অবসর সময়ে তিনি ছোটখাট যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যাপৃত থাকতেন। তারই ফল এই ওরেরী। এই ওরেরীই কিন্তু আজও তার নাম অমর করে রেখেছে। এই ওরেরী থেকেই জার্মেনীতে সর্বপ্রথম প্ল্যানেটোরিয়ামের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল।

গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান এবং গতিবিধি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯১৩ খৃস্টাব্দে মিউনিক মিউজিয়ামের জন্যে ওরেরীর অনুকরণে এক বিরাট মডেল তৈরি হয়। এতে একটা সুবৃহৎ মডেল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোট্ট টেলিস্কোপের সাহায্যে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত আলোক জ্যোতিষ্কগুলোকে দেখতে হতো। তারপর জেনার জাইস্ কোম্পানী কর্তৃক আধুনিক উন্নত ধরনের প্ল্যানেটোরিয়াম নির্মিত হয়। অতি জটিল যান্ত্রিক কৌশলে এতে পূর্বেকার সকল রকমের অসুবিধা দূর করা হয়েছে। এই প্ল্যানেটোরিয়ামের সাহায্যে দর্শকেরা দেখে সৌরজগৎ এবং তার বাইরের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যাবতীয় ব্যাপার সহজেই একটা বিরাট ডাম্বেলের মত। তারই বিভিন্ন অংশে, স্থূল ও সূক্ষ্ম অসংখ্য বিচিত্র যন্ত্রপাতির সমাবেশ। বিভিন্ন রকমের লেন্সের সাহায্যে ডাম্বেলের একটা গোলক থেকে উত্তর আকাশের এবং অপরটা থেকে দক্ষিণ আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অনুকৃতি, ছোট বড় আলোর গোলকের মত তাদের স্বাভাবিক অবস্থানস্থল অনুযায়ী গম্বুজের গায়ে প্রক্ষেপ করা হয়।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে কেউ উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ যেমন উত্তরের আকাশ অদৃশ্য হয়ে দক্ষিণের আকাশ দেখা দেয়, যন্ত্র-কৌশলে ডাম্বেল-টিকেও এদিক-ওদিক একটু হেলিয়ে দিয়ে ঠিক তেমন করেই উত্তর বা দক্ষিণ আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে ইচ্ছামত গম্বুজের উপর প্রতিফলিত করা যেতে পারে। পৃথিবীর নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘোরবার গতিবিধি দেখা যায়, ডাম্বেলের মত যন্ত্রটা যে কোন ভাবে থেকে লম্বা দণ্ডের উপর ঘুরলেই গম্বুজে প্রতিফলিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও ঠিক সেরকম গতিবিধি দেখা যাবে। মোটের উপর, পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে আমরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে যে অবস্থায়, যেমন ভাবে স্থান বা আকৃতি পরিবর্তন করতে দেখি, প্ল্যানেটোরিয়ামেও সেগুলোকে ঠিক তেমনটিই দেখতে পাওয়া যায়। প্ল্যানেটোরিয়ামে দর্শকদের মনে হবে তারা সত্যিকার আকাশটাই দেখছেন। তাছাড়া, বর্তমানের তুলনায় সুদূর অতীতে বা সুদূর ভবিষ্যতে গ্রহ-উপগ্রহগুলোর অবস্থানস্থল বা আকৃতিগত কি পার্থক্য ছিল বা হতে পারে, প্ল্যানেটোরিয়ামে সেগুলোও প্রদর্শন করবার ব্যবস্থা আছে।

রচনাকাল, ১৯৪৮

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার

৮৪